পয়গামে সুলেহ্
(শান্তির বার্তা)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আঃ)

অনুবাদ
আল্লামা জিল্লুর রহমান

প্রকাশনায়
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

ভূমিকা

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ১৯০৮ সালে পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। তাঁর মৃত্যুর দু'দিন পূর্বে তিনি **পয়গামে সুলেহ্** (শান্তির বার্তা) নামক এ পুস্তিকাখানি উর্দূতে লেখেন। এটাই তাঁর জীবনের শেষ লেখা।

তাঁর সময়ে তৎকালীন বৃটিশ ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানের মাঝে সাম্প্রদায়িক বিরোধ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এ বিরোধের আজো অবসান হয় নি। প্রায় প্রতি বছর এ উপমহাদেশের কোথাও না কোথাও হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনা ঘটেই চলেছে। এহেন অবস্থায় হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক কলহ দূর করার জন্য হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) তাঁর এ পুস্তিকায় অবিভক্ত ভারতবর্ষের এ দুটো জাতির মাঝে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সন্ধির আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, কারো স্বীকৃত পয়গম্বর ও ঐশী ধর্ম গ্রন্থের প্রতি নিন্দা ও মিথ্যারোপ করে আক্রমণ করাটাই সন্ধির পথে বাধা।

তিনি বলেন, আমরা কখনো অন্য জাতির নবীগণের দুর্নাম করি না। কেননা যদি তাঁরা খোদার পক্ষ থেকে না হোতেন তবে কোটি কোটি লোকের হৃদয়ে তাঁদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হতো না। এরই ভিত্তিতে আমরা বেদকেও খোদার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বলে বিশ্বাস করি এবং এর ঋষিদেরকে সম্মানিত ও পবিত্র মনে করি। তদ্রূপে শান্তি স্থাপনের জন্য তিনি আমাদের নবী (সঃ)-কে খোদার সত্য নবী বলে মেনে নিতে এবং ভবিষ্যতে তাঁর অবমাননা করা ও তাঁকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করা থেকে বিরত থাকতে হিন্দু ও আর্য সমাজীগণকে আহ্বান জানান।

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যকার শত্রুতা ও বিদ্বেষের মূল কারণ ধর্মীয় ঝগড়া এবং এটা রাজনৈতিক ঝগড়া নয় বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি বলেছেন, 'হে মুসলমানগণ! আপনাদের ও হিন্দুদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ কেবল তখন দূর হতে পারে যখন আপনারা বেদ ও বেদের ঋষিদেরকে সরল অন্ত:করণে খোদার পক্ষ থেকে এসেছেন বলে স্বীকার করে নেবেন। তেমনিভাবে হিন্দুগণও আমাদের নবী (সঃ)-এর নবুওয়তকে সত্য বলে স্বীকার করে নেবেন। এমনটি হলেই ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ চিরকালের জন্য তিরোহিত হয়ে যাবে।'

আহমদী মিশনারী আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব ১৯৪৩ সালে 'পয়গামে সুলেহ্' পুস্তিকাটি সাধু বাংলায় অনুবাদ করেন। অজ্ঞাত কারণে পুস্তিকাটির কোন কোন অংশের

অনুবাদ তখন করা হয় নি। এছাড়া হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) এ পুস্তিকাটি সম্পর্কে তাঁর পাণ্ডুলিপিতে যে সকল নোট লিখেছিলেন, সেগুলোরও অনুবাদ করা হয় নি।

অতএব জামাতের ডাকে সাড়া দিয়ে জনাব নাজির আহমদ ভুঁইয়া পুস্তিকাটির সম্পূর্ণটাই প্রাঞ্জল, সাবলীল ও চলিত ভাষায় পুনঃ অনুবাদ করেন। আমাদের সদর মুরব্বী মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব মূল পুস্তিকার সাথে মিলিয়ে বঙ্গানুবাদটির প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছেন। জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান অনুবাদের শেষ প্রুফটি দেখে দিয়েছেন। করুণাময় আল্লাহ্‌তাআলা সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন।

বিশ্বের বাংলা ভাষা-ভাষী হিন্দু-মুসলমান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে আমরা আকুল আহ্বান জানাচ্ছি তাঁরা যেন এ পুস্তিকায় বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ উপদেশের আলোকে হিন্দু-মুসলিম বিরোধের প্রকৃত সমাধানের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হন। তবেই আমাদের এ বঙ্গানুবাদ প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

খাকসার

মোবাশ্‌শেরউর রহমান

ন্যাশনাল আমীর

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

ঢাকা

১৪ই এপ্রিল, ২০০৩ইং

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

পয়গামে সুলেহ্
(শান্তির বার্তা)

হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা! হে আমার প্রিয় পথ-প্রদর্শক! তুমি আমাকে সে পথ দেখাও, যে পথে নিষ্ঠাবান ও নির্মল হৃদয়ের লোকগণ তোমাকে পেয়ে থাকেন এবং আমাদেরকে ঐ সকল পথ হতে রক্ষা কর যার লক্ষ্য কেবল কামনা-বাসনা বা বিদ্বেষ, হিংসা বা পার্থিব লোভ-লালসা।

অতঃপর হে শ্রোতাগণ! শত শত মতভেদ থাকা সত্ত্বেও আমরা হিন্দুই হই আর মুসলমানই হই আমরা ঐ খোদার প্রতি বিশ্বাস আনার ক্ষেত্রে অংশীদার, যিনি পৃথিবীর স্রষ্টা ও অধিপতি। এরূপেই আমরা মানুষ নাম ধারণের ক্ষেত্রেও অংশীদার, অর্থাৎ আমাদের সকলকেই মানুষ বলা হয়। তদ্রূপেই একই দেশের অধিবাসী হওয়ার দরুনও আমরা একে অন্যের প্রতিবেশী। তাই নির্মল হৃদয় ও শুভেচ্ছার সাথে আমাদের একে অন্যের বন্ধু হয়ে যাওয়া কর্তব্য। তাছাড়া ধর্মীয় ও পার্থিব বিপদাপদে একে অন্যের প্রতি সহানুভূতি দেখানো উচিত এবং এরূপ সহানুভূতি দেখানো উচিত যেন একে অন্যের দেহের অংশ হয়ে যাই।

হে স্বদেশবাসীগণ! সে ধর্ম ধর্ম নয়, যাতে সাধারণ সহানুভূতির শিক্ষা নেই এবং সে মানুষ মানুষ নয়, যার মধ্যে সহানুভূতির গুণ নেই। আমাদের খোদা কোন জাতির মধ্যে পার্থক্য করেন নি। উদাহরণস্বরূপ, যে সমস্ত মানবীয় শক্তি ও ক্ষমতা আর্যাবর্তের আদিম জাতিদেরকে দেয়া হয়েছিল, ঐ সমস্ত শক্তিই আরব, পারস্য, সিরিয়া, চীন ও জাপানের অধিবাসীদেরকে এবং ইউরোপ ও আমেরিকার জাতিগুলোকেও দেয়া হয়েছে। সকলের জন্য খোদার জমীন বিছানার কাজ করছে। সকলের জন্য তাঁর সূর্য, চন্দ্র ও আরো অনেক নক্ষত্র উজ্জ্বল প্রদীপের কাজ করছে এবং অন্যান্য সেবাও করছে। তাঁর সৃষ্ট জড়-প্রকৃতি, অর্থাৎ বায়ু, পানি, আগুন, মাটি এবং তেমনিভাবেই তাঁর সৃষ্ট অন্যান্য সকল বস্তু যথা শাক-সব্জি, ফল, ঔষধ ইত্যাদি থেকে সকল জাতি উপকৃত হচ্ছে। অতএব আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের এ সকল রীতি এ শিক্ষাই দিচ্ছে আমরাও যেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের প্রতি সৌজন্য ও সৌহার্দ্য দেখাই এবং অনুদার ও সঙ্কীর্ণমনা না হই।

বন্ধুগণ! নিশ্চয় জানবেন, যদি আমাদের দু'জাতির কোনও জাতি খোদার গুণের সম্মান না করে এবং নিজেদের আচার-আচরণ তাঁর পবিত্র গুণাবলীর বিপরীত গঠন করে তবে সেই জাতি শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা কেবল নিজেরাই ধ্বংস হবে না, বরং নিজেদের বংশধরকেও ধ্বংস করে দেবে। যখন থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকে সকল দেশের সাধু পুরুষগণ এ সাক্ষ্য দিয়ে আসছেন যে, খোদার গুণের

অনুসরণকারী হওয়া মানুষের স্থায়িত্বের জন্য এক জীবন সুধা। খোদার সকল পবিত্র গুণের অনুসরণ মানুষের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সাথে জড়িত। এটাই শান্তির উৎস।

খোদা কুরআন শরীফকে প্রথমে এ আয়াত দিয়েই শুরু করেছেন, যা সূরা ফাতেহায় রয়েছে- "আলহামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন" অর্থাৎ সকল পূর্ণ ও পবিত্র গুণ খোদারই, যিনি সকল 'আলম' (জগৎ-অনুবাদক)-এর প্রভু-প্রতিপালক। 'আলম' শব্দে বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন যুগ ও বিভিন্ন দেশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ আয়াত দিয়ে যে কুরআন শরীফ শুরু করা হয়েছে এতে প্রকৃতপক্ষে সেই সকল জাতির (মতবাদ) খন্ডন করা হয়েছে, যারা খোদাতাআলার সর্বব্যাপক প্রতিপালন ও অনুগ্রহকে কেবল নিজেদের জাতিতে সীমাবদ্ধ রাখে এবং অন্যান্য জাতিকে এরূপ মনে করে যেন তারা খোদাতাআলার বান্দাই নয়, খোদা যেন তাদেরকে সৃষ্টি করে আবর্জনার ন্যায় ছুঁড়ে ফেলেছেন বা তাদেরকে ভুলে গেছেন, অথবা মাআযাল্লাহ্ (আল্লাহ্ রক্ষা করুন) তারা তাঁর সৃষ্টিই নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইহুদী ও খৃষ্টানরা আজো এ ধারণাই পোষণ করে, খোদার যত নবী ও রসূল এসেছেন তাঁরা কেবল ইহুদীদের বংশ থেকেই এসেছেন, আর খোদা অন্যান্য জাতির প্রতি এত বিরূপ যে, তাদেরকে বিপথগামী ও উদাসীন দেখেও তিনি তাদেরকে গ্রাহ্যই করেন নি, যেমন ইঞ্জিলেও লিখিত আছে, হযরত মসীহ্ আলায়হেস সালাম বলেন, আমি কেবল ইস্রাঈলীদের হারানো মেষের জন্য এসেছি। এ স্থলে আমি তর্কের খাতিরে বলছি, খোদা হওয়ার দাবী করে এরূপ সঙ্কীর্ণ ধারণার কথা বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার। মসীহ্ কি শুধু ইস্রাইলীদের খোদা ছিলেন এবং অন্যান্য জাতির খোদা ছিলেন না যে, তাঁর মুখ হতে এরূপ কথা বের হলো? অন্যান্য জাতির সংস্কার ও পথ-প্রদর্শনের তাঁর কি কোন প্রয়োজন নেই?

মোট কথা, ইহুদী ও খৃষ্টানদের ধর্মমত এটাই, সকল নবী ও রসূল কেবল তাদের বংশ থেকেই আসতে থাকেন আর তাদের বংশেই খোদার কেতাবসমূহ অবতীর্ণ হতে থাকে। অন্যদিকে খৃষ্টানদের ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী ঐশী বাণীর ধারা হযরত ঈসা আলায়হেস সালাম পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে এবং ঐশী বাণীর উপর মোহর লেগে গেছে।

আর্য্য সমাজীগণকেও এ একই মতের অনুসরণ করতে দেখা যায়। অর্থাৎ যেভাবে ইহুদী ও খৃষ্টানেরা নুবওয়ত ও ঐশী বাণীকে ইস্রাঈলী বংশেই সীমাবদ্ধ রাখে এবং অন্যান্য সকল জাতিকে ঐশী বাণী লাভের গৌরব থেকে বিদায় করে দিচ্ছে, মানব জাতির দুর্ভাগ্যবশতঃ আর্য্য সমাজীগণও এ ধর্ম বিশ্বাসই গ্রহণ করে নিয়েছেন। অর্থাৎ তারাও এ বিশ্বাসই পোষণ করেন, খোদার বাণীর ধারা আর্য্যাবর্তের চার দেয়ালের বাইরে কখনো যায় নি, সর্বদা এ দেশ থেকেই চারজন ঋষি নির্বাচিত হয়ে থাকেন, সর্বদা বেদই বারবার অবতীর্ণ হয় এবং সর্বদা বৈদিক সংস্কৃতকেই এ ঐশী বাণীর জন্য

নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর ফলে এ দু' জাতিই খোদাকে বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক মনে করেনা। নইলে এর কোন কারণ জানা যায় না, যেক্ষেত্রে খোদা বিশ্ব জগতের প্রভু-প্রতিপালক, কেবল ইস্রাঈলীদের প্রভু-প্রতিপালক নন বা কেবল আর্য্য সমাজীদের প্রভু-প্রতিপালক নন, সেক্ষেত্রে তিনি এক বিশেষ জাতির সাথে কেন এরূপ স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন করেন যাতে প্রকাশ্যভাবে পক্ষপাতিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং এ সকল ধর্ম-বিশ্বাস খন্ডন করার জন্যও খোদাতাআলা কুরআন শরীফে 'আলহামদুলিল্লাহে রব্বিল আলামীন' (অর্থাৎ সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের জন্য - অনুবাদক) আয়াত দিয়ে শুরু করেছেন।তিনি কুরআন শরীফের বহু জায়গায় পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন, এ কথা সত্য নয় যে কোন বিশেষ জাতিতে বা বিশেষ দেশে খোদার নবী আসতে থাকেন। বরং খোদা কোন জাতি ও কোন দেশকেই ভুলেন নি। কুরআন শরীফে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে, যেভাবে খোদা প্রত্যেক দেশের অধিবাসীদেরকে তাদের অবস্থা অনুযায়ী তাদের দৈহিক প্রতিপালন করে আসছেন, সেভাবেই তিনি প্রত্যেক দেশকে ও প্রত্যেক জাতিকে আধ্যাত্মিক প্রতিপালনের মাধ্যমেও অনুগৃহীত করেছেন, যেমন তিনি কুরআন শরীফে এক জায়গায় বলেন, 'ওয়া ইম্‌মিন উম্মাতিন ইল্লাখালা ফীহা নাযীর।' অর্থাৎ এমন কোন জাতি নেই, যাদের মাঝে কোন নবী বা রসূল পাঠানো হয় নি।

সুতরাং এ কথা কোন তর্ক ছাড়াই মেনে নেয়ার যোগ্য যে, ঐ সত্যের ও সর্বগুণের অধিকারী খোদা বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক যার প্রতি প্রত্যেক বান্দার বিশ্বাস করা উচিত। তাঁর প্রতিপালন কোন বিশেষ জাতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, না কোন বিশেষ যুগ পর্যন্ত এবং না কোন বিশেষ দেশ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ; বরং তিনি সকল জাতির প্রভু-প্রতিপালক, সকল যুগের প্রভু-প্রতিপালক, সকল জায়গার প্রভু-প্রতিপালক এবং সকল দেশের তিনিই প্রভু-প্রতিপালক। তিনিই সকল কল্যাণের ও সকল দৈহিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস। সকল সৃষ্ট বস্তু তাঁর দ্বারাই প্রতিপালিত হচ্ছে এবং সকল অস্তিত্বের তিনিই আশ্রয়স্থল।

খোদার অনুগ্রহ সর্বব্যাপক। তা সকল জাতি, সকল দেশ ও সকল যুগকে ঘিরে রেখেছে। এর কারণ হলো, কোন জাতি যেন অভিযোগ করার সুযোগ না পায় এবং এ কথা বলতে না পারে খোদা অমুক অমুক জাতির প্রতি অনুগ্রহ করেছেন; কিন্তু আমাদের প্রতি তা করেন নি বা অমুক জাতি তাঁর পক্ষ থেকে সত্য পথ পাওয়ার জন্য ঐশী গ্রন্থ পেয়েছে, কিন্তু আমরা পাই নি বা অমুক যুগে তিনি তাঁর বাণী ও অলৌকিক নিদর্শনসহ প্রকাশিত হয়েছেন, কিন্তু আমাদের যুগে তিনি গোপন রয়েছেন। অতএব তিনি ব্যাপক অনুগ্রহ দেখিয়ে এ সকল আপত্তি খন্ডন করে দিয়েছেন এবং নিজের সর্বব্যাপক গুণ এভাবে দেখিয়েছেন যে, কোন জাতিকে তিনি দৈহিক ও আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত রাখেন নি এবং কোন যুগকেই তিনি বঞ্চিত করেন নি।

অতএব আমাদের খোদার যখন এ নীতি, আমাদেরও এ নীতিরই অনুসরণ করা কর্তব্য। সুতরাং হে আমার স্বদেশবাসী ভাইগণ! এ সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাটি, যার নাম 'পয়গামে সুল্হ' (শান্তির বার্তা) তা সম্মানের সাথে আপনাদের নিকট উপস্থিত করছি এবং সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করছি সেই সর্বশক্তিমান খোদা নিজেই যেন আপনাদের হৃদয়ে প্রেরণা দান করেন এবং আমার সহানুভূতির প্রকৃত স্বরূপ আপনাদের নিকট প্রকাশ করেন, যাতে আপনারা এ বন্ধুত্বের উপহারকে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ও ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে না করেন। বন্ধুগণ! পরকালের বিষয়তো সাধারণ লোকের নিকট প্রায়ই গোপন থাকে এবং এর রহস্য কেবল তাদের নিকটই প্রকাশিত হয়, যারা মৃত্যুর পূর্বেই মরে যায় (অর্থাৎ আল্লাহ্তে আত্মবিলীন হয়ে যায়-অনুবাদক)। কিন্তু প্রত্যেক সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিই পার্থিব ভালমন্দ চিনে নিতে পারে।

এ কথা কারো অজানা নেই, একতা এমন একটি শক্তি যে, ঐ সকল বিপদ যা কোনভাবেই দূর হয় না এবং ঐ সকল সমস্যা যা কোন প্রচেষ্টাতেই সমাধান হয় না, তা একতার দ্বারাই সমাধান হয়ে যায়। অতএব একতার কল্যাণ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এদেশে হিন্দু ও মুসলমান এমন দু'টি জাতি, দৃষ্টান্তস্থলে বলতে হয়, কোন সময় তাদের মধ্যে হিন্দুরা একত্রিত হয়ে মুসলমানদেরকে এদেশ থেকে বের করে দেবে বা মুসলমানেরা একত্রিত হয়ে হিন্দুদেরকে এদেশ থেকে বের করে দেবে, এটা এক অসম্ভব ধারণা। বরং এখনতো হিন্দু ও মুসলমানের ভাগ্য এক সুতায় গাঁথা হয়ে গেছে। যদি এক জাতির উপর বিপদ আসে তবে অন্য জাতিও এর অংশীদার হয়ে যাবে। আর যদি এক জাতি অন্য জাতিকে কেবল নিজেদের অহংকার ও দাম্ভিকতার দরুন লাঞ্ছিত করতে চায় তবে তারাও লাঞ্ছনার কালিমা থেকে রেহাই পাবে না। যদি তাদের মাঝে কেউ নিজ প্রতিবেশীকে সহানুভূতি দেখাতে ত্রুটি করে তবে এর ক্ষতি তাকেও ভুগতে হবে। তোমাদের দু'জাতির যে কেউ অন্য জাতির ধ্বংসের চিন্তা করে, সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে একটি শাখায় বসে সেই শাখাকেই কাটে। আপনারা আল্লাহ্তাআলার অনুগ্রহে শিক্ষিতও হয়েছেন, এখন ঈর্ষা ছেড়ে ভালবাসার দিকে অগ্রসর হওয়াই আপনাদের জন্য শোভনীয়। হৃদয়ের কঠোরতা ও অবজ্ঞা ছেড়ে সহানুভূতিশীল হওয়াই আপনাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। তা না হলে আপনাদের অবস্থা পার্থিব সমস্যাবলীতে জড়িয়ে প্রচন্ড রোদের তাপের সময় মরুভূমিতে ভ্রমণ করার ন্যায় হয়ে যাবে। অতএব এ দুর্গম পথের জন্য পারস্পরিক একতার সেই শীতল পানির প্রয়োজন, যা এ জ্বলন্ত আগুনকে নিবিয়ে দেবে ও পিপাসার সময় মৃত্যু থেকে রক্ষা করবে।

এরূপ সংকটকালে আমি আপনাদেরকে সন্ধির জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। এখন উভয় জাতির জন্য সমঝোতার একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের বিপদ আপদ নেমে আসছে। ভূমিকম্প আসছে। দুর্ভিক্ষ আসছে। প্লেগও এখনো লেগেই

আছে। খোদা আমাকে যা কিছু জানিয়েছেন তা হলো, যদি পৃথিবী নিজ অসৎ কর্ম থেকে বিরত না হয় এবং মন্দ কাজ থেকে না ফিরে তবে পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর বিপদ-আপদ আসবে। আর একটি বিপদ শেষ না হতেই অন্য বিপদ এসে উপস্থিত হবে। অবশেষে মানুষ নিতান্ত দিশেহারা হয়ে বলবে, এ কী হতে চলেছে। আর বহু লোক বিপদে পড়ে পাগলের ন্যায় হয়ে যাবে।

অতএব হে স্বদেশবাসী ভাইয়েরা! সেদিন আমার পূর্বেই সাবধান হয়ে যাও, হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের মধ্যে সন্ধি করে নেয়া উচিত। যে জাতির কোন বাড়াবাড়ি এ সন্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সেই জাতি যেন এ বাড়াবাড়ি ত্যাগ করে। নচেৎ পরস্পরের শত্রুতার সমস্ত পাপ ঐ জাতির ঘাড়ে চাপবে।

যদি কেউ জিজ্ঞেস করে কেমন করে সন্ধি হতে পারে, সেক্ষেত্রে এ কথাই বলবো পারস্পরিক ধর্মীয় মতভেদ সন্ধির পথে এরূপ একটি বাধা, যা দিন দিন মানুষের হৃদয়ে বিদ্বেষ সৃষ্টি করেই চলেছে।

এর উত্তরে আমি এ কথাও বলবো, প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় মতভেদ কেবল এই মতভেদেরই নাম, যে ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই মনে করে তারা জ্ঞান-বুদ্ধি, ন্যায়-বিচার ও প্রত্যক্ষ বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। নতুবা মানুষকে তো এ জন্য বিবেক-বুদ্ধি দেয়া হয়েছে তারা যেন এরূপ অবস্থান গ্রহণ করে যা বিবেক-বুদ্ধি ও ন্যায় বিচারসম্মত এবং যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষ বিষয়গুলোর বিরোধী না হয়। ছোট ছোট মতভেদ সন্ধির পথে বাধা হতে পারে না। বরং ঐ মতভেদই সন্ধির পথে বাধা হবে, যা কারো স্বীকৃত পয়গম্বর ও ঐশী ধর্ম গ্রন্থের প্রতি নিন্দা ও মিথ্যারোপ করে আক্রমণ করে।

এ ছাড়া শান্তি-কামীদের জন্য একটা আনন্দের বিষয় আছে। তা হলো, ইসলামে যতগুলো শিক্ষা রয়েছে তা বৈদিক শিক্ষার কোন না কোন শাখায় বিদ্যমান রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদিও নব-সৃষ্ট ধর্মমতাবলম্বী আর্য্য সমাজের মতে বেদের পর ঐশী বাণীর উপর মোহর লেগে গেছে (অর্থাৎ ঐশী বাণী বন্ধ হয়ে গেছে), কিন্তু হিন্দু ধর্মে বিভিন্ন সময়ে যে সকল অবতার আবির্ভূত হয়েছেন, যাঁদের মান্যকারী কোটি কোটি লোক এ দেশে রয়েছে, তাঁরা (অর্থাৎ এ সকল অবতার -অনুবাদক) ঐশী বাণী পাওয়ার দাবীর মাধ্যমে এ মোহর ভেঙ্গে দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, এ দেশে ও বাংলাদেশে এক মহা অবতারকে খুব সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে মান্য করা হয়। তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণ। তিনি ঐশী বাণীপ্রাপ্ত হওয়ার দাবী করেন। তাঁর অনুসারীগণ তাঁকে কেবল ঐশীবাণীপ্রাপ্ত নয়, বরং পরমেশ্বর বলেও মান্য করেন। কিন্তু এতে সন্দেহ নেই, তিনি তাঁর যুগের নবী ও অবতার ছিলেন এবং খোদা তাঁর সাথে কথা বলতেন।

এরূপেই এ শেষ যুগে হিন্দু জাতিতে বাবা নামক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বুযূর্গীর খ্যাতি এ দেশ জুড়ে জনগণের মুখে মুখে ফিরছে। তাঁর অনুসারীগণকে এ দেশে শিখ

জাতি বলা হয়। তারা বিশ লাখের কম হবে না। বাবা সাহেব তাঁর জনম শাখি কবিতাগুলোতে ও গ্রন্থ সাহেব পুস্তকে প্রকাশ্যভাবে ঐশী বাণী পাওয়ার দাবী করেছেন। এমন কি তিনি তাঁর এক জনম শাখিতে লেখেন, আমি খোদার পক্ষ থেকে বাণী পেয়েছি যে, ইসলাম ধর্ম সত্য। এরই ভিত্তিতে তিনি হজ্জও করেন এবং সকল ইসলামী ধর্ম বিশ্বাসের আনুগত্য করেন। নিঃসন্দেহে এটা প্রমাণিত হয়েছে, তাঁর দ্বারা বহু অলৌকিক ক্রিয়া ও নিদর্শনও প্রকাশিত হয়েছে। এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না বাবা নামক একজন পুণ্যবানও আল্লাহ্‌র মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সেই সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাঁদেরকে খোদা নিজ প্রেম-সুধা পান করিয়ে থাকেন। তিনি হিন্দুদের মধ্যে কেবল এ কথার সাক্ষ্য দেয়ার জন্য জন্ম লাভ করেছিলেন যে, ইসলাম খোদার পক্ষ থেকে এসেছে। যে ব্যক্তি তাঁর সে সকল 'তাবার্‌রুক' (আশীষমন্ডিত বস্তু) দেখবে, যা ডেরা বাবা নানকে বিদ্যমান রয়েছে, যাতে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তিনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌' কলেমার সাক্ষ্য দিয়েছেন, এবং ঐসকল তাবার্‌রুকও দেখবে যাতে একখানা কুরআন শরীফও রয়েছে যা ফিরোজপুর জেলায় অবস্থিত গুরুহাট সহায় নামক স্থানে বিদ্যমান রয়েছে, তার সন্দেহ থাকবে না যে, বাবা নানক সাহেব তাঁর পবিত্র হৃদয় ও পবিত্র স্বভাব এবং পবিত্র সাধনা দ্বারা ঐ রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছিলেন যা বাহ্যদর্শী পন্ডিতদের নিকট গোপন ছিল। তিনি ঐশী বাণী পাওয়ার দাবী করেন এবং খোদার পক্ষ থেকে নিদর্শন ও অলৌকিক ক্রিয়া দেখিয়ে বেদের পরে কোন ঐশী বাণী আসবে না এবং নিদর্শন প্রকাশিত হবে না বলে যে ধর্ম বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে তা সুস্পষ্টরূপে খন্ডন ও রদ করেন। নিঃসন্দেহে বাবা নানক সাহেবের আবির্ভাব হিন্দুদের জন্য খোদার পক্ষ থেকে এক অনুগ্রহ ছিল। এরূপ মনে করা যেতে পারে, তিনি হিন্দু ধর্মের শেষ অবতার ছিলেন। হিন্দুদের হৃদয়ে ইসলাম সম্পর্কে যে ঘৃণা ছিল তিনি তা দূর করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এদেশের এটাও দুর্ভাগ্য, হিন্দু ধর্ম বাবা নানকের শিক্ষা থেকে কোন উপকার গ্রহণ করে নি। বরং পন্ডিতেরা তাঁকে এ জন্য দুঃখ দিয়েছেন, কেন তিনি জায়গায় জায়গায় ইসলামের প্রশংসা করেন। তিনি হিন্দু ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করতে এসেছিলেন। কিন্তু আফসোস্‌, তাঁর শিক্ষার দিকে কেউই মনোযোগ দেয় নি। যদি তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব ও তাঁর শিক্ষা থেকে কিছু মাত্র উপকার গ্রহণ করা হতো তবে আজ হিন্দু ও মুসলমান সকলে এক হতো। হায় আফসোস! এ কথা ভাবলেও আমার কান্না আসে যে, এরূপ মহান ব্যক্তি পৃথিবীতে এলেন এবং চলেও গেলেন, কিন্তু অজ্ঞ লোকেরা তাঁর জ্যোতিঃ থেকে সামান্য আলোও লাভ করলো না।

যাহোক তিনি এ কথা প্রমাণ করে গেছেন, খোদার বাণী ও তাঁর কথা কখনো বন্ধ হয় না এবং খোদার নিদর্শন তাঁর মনোনীত ব্যক্তিগণের মাধ্যমে সব সময় প্রকাশিত হয়ে থাকে। তিনি এ কথার সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন, ইসলামের শত্রুতা মানে জ্যোতির সাথে শত্রুতা বৈ আর কিছু নয়।

এভাবেই আমিও এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, নিশ্চয় খোদার ওহী ও খোদার ইলহাম এ যুগেও বন্ধ হয় নি। বরং খোদা পূর্বে যেভাবে বলতেন এখনো সেভাবে বলেন, এবং যেভাবে পূর্বে শুনতেন এখনো সেভাবে শুনেন। এমন নয় যে, তাঁর সনাতন গুণাবলী রহিত হয়ে গেছে। আমি প্রায় ত্রিশ বছর যাবৎ আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলায় ও তাঁর সম্বোধনে সম্মানিত হয়ে আসছি এবং তিনি আমার হাতে শত শত নিদর্শন দেখিয়েছেন। হাজার হাজার লোক এর সাক্ষী রয়েছে এবং বহু পুস্তকে ও পত্র-পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছে। এমন কোন জাতি নেই যারা কোন না কোন নিদর্শনের সাক্ষী নয়।

অতএব এত ধারাবাহিক সাক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও খামাখা বেদের প্রতি আরোপিত আর্য্য সমাজীদের এ শিক্ষা কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? তারা বলে, খোদার কথা ও ইলহামের সমস্ত ধারা বেদে এসে শেষ হয়ে গেছে। তারপর কেবল কেচ্ছা-কাহিনীর উপর নির্ভর করতে হবে। এ বিশ্বাসটুকু হাতে নিয়েই তারা বলে, বেদ ছাড়া পৃথিবীতে ঐশী বাণীর নামে যত পুস্তক রয়েছে সেগুলো 'নাউযুবিল্লাহ্' (এরূপ ধারণা থেকে আল্লাহ্ রক্ষা করুন- অনুবাদক) মানুষের বানানো; অথচ সেই সকল পুস্তক বেদের চেয়ে অনেক বেশি নিজেদের সত্যতার প্রমাণ পেশ করছে, সেগুলোর সাথে খোদার সাহায্য ও সহায়তার হাত রয়েছে এবং খোদার অসাধারণ নিদর্শন সেগুলোর সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাহলে কেবল বেদই কেন খোদার কথা হবে এবং অন্যান্য পুস্তক (ধর্ম গ্রন্থ) খোদার কথা হবে না কেন? খোদার সত্তা যেহেতু সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর এবং গোপন থেকে গোপনতর, সেজন্য মানুষের বিবেকও এটাই চায়, তিনি যেন তাঁর সত্তা প্রমাণ করার জন্য একটি ধর্মগ্রন্থ দিয়েই ক্ষান্ত না হন, বরং বিভিন্ন দেশ থেকে নবী নির্বাচিত করে তাঁর কথা ও বাণী তাদেরকে দান করেন যাতে দুর্বলচিত্ত সন্ধিগ্ধমনা মানুষ তাদেরকে গ্রহণ করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত না থাকে।

আর বিবেক কখনো এ কথা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়, সেই খোদা যিনি সমস্ত জগতের খোদা, যিনি তাঁর সূর্য দ্বারা পূর্ব ও পশ্চিমকে আলোকিত করেন এবং তাঁর মেঘ দ্বারা প্রত্যেক দেশকে প্রতিটি প্রয়োজনের সময় সিঞ্চিত করেন, তিনি নাউযুবিল্লাহ্ (আল্লাহ্ রক্ষা করুন-অনুবাদক) আধ্যাত্মিক শিক্ষা দানে এরূপ সঙ্কীর্ণ ও কৃপণ যে, চিরকালের জন্য তিনি কেবল একটি দেশ ও একটি জাতি ও একটা ভাষাকেই পছন্দ করে নিয়েছেন! আমি বুঝতে পারি না এটা কি ধরনের যুক্তি ও কি প্রকারের দর্শন যে, পরমেশ্বর প্রত্যেক মানুষের দোয়া ও প্রার্থনা তার নিজ ভাষায় বুঝতে পারেন এবং তা ঘৃণা করেন না, কিন্তু বৈদিক সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোন ভাষায় মানব হৃদয়ে ইলহাম (ঐশী বাণী) করতে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করেন। এ দর্শন বা বেদ বিদ্যা এরূপ দুর্বোধ্য প্রহেলিকার ন্যায়, যার সমাধান আজ পর্যন্ত কোন মানুষ দিতে পারে নি।

আমি এমন কথা থেকে বেদকে পবিত্র মনে করি যে, এটা কখনো এর কোন পৃষ্ঠায় এরূপ শিক্ষা প্রকাশ করেছে যা কেবল বিচার বুদ্ধির পরিপন্থীই নয়, বরং পরমেশ্বরের পবিত্র সত্তার প্রতি কার্পণ্য ও পক্ষপাতিত্বের কালিমাও লেপন করে। বরং প্রকৃত কথা হলো, যখন কোন ঐশী গ্রন্থ আসার পর এক সুদীর্ঘ কাল পার হয়ে যায় তখন এর অনুসারীরা কিছুটা অজ্ঞতার জন্য এবং কিছুটা নিজেদের হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এ গ্রন্থে নিজেদের পক্ষ থেকে টীকা-টিপ্পনী বসিয়ে দেয়। আর যেহেতু যারা টীকা-টিপ্পনী বসিয়ে থাকে তারা বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার লোক হয়ে থাকে, এ জন্য এক ধর্ম থেকে শত শত ধর্মের জন্ম হয়ে যায়।

আর আশ্চর্যের কথা হলো, যেরূপ আর্য্য সমাজীগণ এ বিশ্বাস পোষণ করেন যে, সর্বদা আর্য্য বংশীয়দের নিকট এবং আর্য্যাবর্তেই ঐশী বাণীর ধারা সীমাবদ্ধ এবং সর্বদা বৈদিক সংস্কৃতই ঐশী বাণীর জন্য এককভাবে নির্দিষ্ট আর এটাই পরমেশ্বরের ভাষা,ইহুদীদের ধারণাও নিজেদের বংশ ও নিজেদের ধর্মগ্রন্থাবলী সম্পর্কে ঠিক তদ্রূপ। তাদের মতেও খোদার আসল ভাষা হিব্রু এবং খোদার বাণীর ধারা সর্বদা বনী ইসরাঈলের মধ্যে ও তাদেরই দেশে সীমাবদ্ধ। আর যে ব্যক্তি তাদের বংশ ও তাদের ভাষা থেকে পৃথক হওয়া অবস্থায় নবী হওয়ার দাবী করে তাঁকে তারা নাউযুবিল্লাহ্ মিথ্যাবাদী মনে করে।

অতএব এ সামঞ্জস্য কি বিস্ময়কর নয় যে, এ দু'টি জাতি তাদের নিজ নিজ বর্ণনায় একই ধারণার বশবর্তী হয়ে চলেছে? এভাবে পৃথিবীতে আরো কিছু সম্প্রদায় আছে, যারা অনুরূপ ধারণারই বশবর্তী, যেমন পারসী জাতি। তারা নিজেদের ধর্মের ভিত্তি বেদের চেয়েও কোটি কোটি বছর পূর্বের বলে বর্ণনা করে। এ থেকে বুঝা যায় এ ধারণা (অর্থাৎ, চিরকালের জন্য নিজেদের দেশ, নিজেদের বংশ এবং নিজেদের ধর্মগ্রন্থের ভাষাকেই খোদার ওহী ও ইলহামের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে বলে মনে করা) শুধু কুসংস্কার ও জ্ঞানের স্বল্পতার দরুন সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু পূর্বের যুগে পৃথিবীর অবস্থা এরূপ ছিল যে, এক জাতি অন্য জাতির অবস্থা সম্বন্ধে এবং এক দেশ অন্য দেশের অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ ছিল, এ জন্য যে, যে জাতির মধ্যে খোদার পক্ষ থেকে কোন ধর্ম গ্রন্থ এসেছে বা খোদার কোন রসূল ও নবী এসেছেন তখন সে জাতি এ ভুলবশতঃ এ কথাই মনে করে নিয়েছে, যা কিছুই খোদার পক্ষ থেকে পথ নির্দেশনা পাওয়ার ছিল তা কেবল এটাই এবং খোদার গ্রন্থ কেবল তাদেরই বংশকে ও তাদেরই দেশকে দেয়া হয়েছে আর সারা পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশ এ থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

এ ধারণা পৃথিবীর অনেক ক্ষতি করেছে। আর জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষের যে বীজ বেড়ে চলেছে, প্রকৃতপক্ষে তাঁর মূল কারণ হচ্ছে এ ধারণা। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এক জাতি অন্য জাতি থেকে পর্দার আড়ালে ছিল এবং এক দেশ অন্য

দেশের নিকট অজ্ঞাত ও গোপন ছিল। এমনকি আর্য্যাবর্তের গুণী-জ্ঞানীদের এ ধারণা ছিল, হিমালয় পর্বতের ওপারে কোন জনবসতি নেই।

অতঃপর খোদা মাঝ থেকে পর্দা উঠিয়ে নিলেন এবং পৃথিবীর জনবসতি সম্পর্কে মানুষের জানা-শোনা কিছুটা বিস্তৃত হয়ে গেল। তখন এমন একটা যুগ ছিল যখন লোকেরা নিজেদের ঐশী গ্রন্থ ও নিজেদের ঋষি এবং রসূলগণ সম্পর্কে যে সকল ভ্রান্ত বৈশিষ্ট্য নিজেদের অন্তরে গড়ে ধর্ম বিশ্বাসের অন্তর্গত করে নিয়েছিল, তা তাদের অন্তরে পাথর-ক্ষোদিত নকশার ন্যায় দৃঢ় হয়ে গিয়েছিল। আর প্রত্যেক জাতি এ ধারণা পোষণ করতো, খোদার কেন্দ্রস্থল সর্বদা তাদের দেশেই রয়েছে। যেহেতু ঐ সময়ে অধিকাংশ জাতির মধ্যে পশুপ্রবৃত্তি প্রবল ছিল এবং প্রাচীন লোকাচার ও দেশাচারের বিরুদ্ধবাদীকে তলোয়ার দিয়ে উত্তর দেয়া হতো, এ জন্য তাদের আত্মম্ভরিতার উত্তেজনাকে শান্ত করে তাদের মাঝে সন্ধি স্থাপন করানোর সাধ্য কারো ছিল না। গৌতম বুদ্ধ এরূপ সন্ধি স্থাপনের ইচ্ছা করেছিলেন। তিনি একথা বিশ্বাস করতেন না, বেদই সব কিছু এবং এর বাইরে কিছু নেই। তিনি জাতি, দেশ এবং বংশের বৈশিষ্ট্যও স্বীকার করতেন না। অর্থাৎ তার ধর্ম-বিশ্বাস এরূপ ছিল না যে, বেদেই সব কিছু সীমাবদ্ধ আর এ ভাষাই এবং এ দেশই ও এ ব্রাহ্মণরাই পরমেশ্বরের বাণী পাওয়ার জন্য তাঁর আদালতে চিরকালের জন্য রেজিষ্ট্রিকৃত হয়ে রয়েছে। তিনি এ মতবিরোধের দরুন বড় কষ্ট ভোগ করেছিলেন এবং তাঁকে নাস্তিক ও নাস্তিকমতবাদধারী আখ্যা দেয়া হয়েছিল, যেভাবে আজকাল ইউরোপ ও আমেরিকার সেই সকল গবেষক পাদরী সাহেবদের মতে তারা সকলেই নাস্তিক যারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর ঈশ্বরত্ব স্বীকার করেনা এবং একথা মানতে রাজী নয় যে খোদাও ক্রুশ বিদ্ধ হতে পারেন।

সুতরাং বুদ্ধকেও এ ধরনেরই নাস্তিক সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং যেহেতু সাধারণের মাঝে ঘৃণা জন্মাবার জন্য তাঁর প্রতি অনেক অপবাদ লাগানো হয়েছিল, সেজন্য দুষ্ট বিরুদ্ধবাদীদের রীতি অনুযায়ী অবশেষে বুদ্ধকে তাঁর দেশ ও মাতৃভূমি আর্য্যাবর্ত্ত থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। তখন পর্যন্ত হিন্দুরা বৌদ্ধ ধর্ম ও এর সফলতাকে অত্যন্ত ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকতো। কিন্তু হযরত ঈসা আলাইহেস সালামের উক্তি 'নিজ জন্মভূমি ছাড়া নবী অন্যত্র অপমানিত হয় না' অনুযায়ী বুদ্ধ অন্য দেশে হিজরত করে বড় সফলতা লাভ করেছিলেন। বলা হয়ে থাকে, পৃথিবীর তিনভাগের এক ভাগ বৌদ্ধ ধর্মে ভরে গেছে। আর অনুসারীদের সংখ্যাধিক্যের দিক থেকে এর প্রকৃত কেন্দ্র চীন ও জাপান, যদিও এ মতবাদ দক্ষিণ রাশিয়া ও আমেরিকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

এখন আমি আমার আসল বিষয়ের দিকে ফিরে এসে লিখছি, যে সকল যুগে এক ধর্মের লোকেরা অন্য ধর্ম সম্পর্কে জানতো না তখন প্রত্যেক জাতি তাদের নিজেদের

ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য ছিল। এরূপ সীমাবদ্ধ থাকার শেষ পরিণাম এ হলো, যখন এক দেশ অন্য দেশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জেনে গেল এবং বিভিন্ন দেশের মানুষ একে অন্যের ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করলো তখন এক দেশের লোকের পক্ষে অন্য দেশের ধর্মের সত্যতা স্বীকার করা কঠিন হয়ে পড়লো। কেননা কবি সুলভ অতিরঞ্জনের দরুন প্রত্যেক ধর্মে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হয়ে পড়েছিল। এগুলো দূর করা কোন সহজ কাজ ছিল না। এ জন্য প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরা অন্য ধর্মকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে বদ্ধপরিকর হলো। যিন্দাবেস্তার ধর্ম 'আমার মত আর কেউ নেই' এর পতাকা উত্তোলন করলো এবং পরগম্বরীর (অর্থাৎ ঐশী বার্তাবাহকের আগমন - অনুবাদক) ধারাকে নিজেদের জাতিতেই সীমাবদ্ধ করলো এবং নিজেদের ধর্মের এত লম্বা-ইতিহাস বর্ণনা করলো যে, বেদের ঐতিহাসিকরা তাদের সামনে লজ্জিত হয়ে পড়লো।

এদিকে ইব্রানী জাতি তাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এভাবে দেখালো যেন তারা খোদার রাজধানী সিরিয়া দেশেই চিরকালের জন্য নির্ধারিত করলো এবং তাদের বংশের মনোনীত লোকেরাই চিরকালের জন্য দেশ সংস্কারের জন্য যোগ্য হিসাবে প্রেরিত হবে বলে সাব্যস্ত করলো। কিন্তু এ সংস্কার কার্য্যতঃ বনী ইসরাঈল জাতিতেই সীমাবদ্ধ রইল। আর ইলহাম ও খোদার ওহী লাভের অধিকার তাদের বংশের জন্যই যেন এক চেটিয়া হয়ে গেল এবং অন্য কেউ উঠলে (অর্থাৎ সংস্কারক হওয়ার দাবী করলে - অনুবাদক) সে মিথ্যাবাদী বলে পরিগণিত হবে।

এরূপেই আর্য্যাবর্তেও হুবহু এ ধারণাই প্রচারিত হয়ে পড়লো, যা ইসরাঈলীদের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল। তাদের বিশ্বাস অনুসারে পরমেশ্বর কেবল আর্য্যাবর্তেরই রাজা, তা-ও এমন রাজা যিনি অন্য দেশের খবরই রাখেন না। আর কোন যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াই এ কথা মেনে নেয়া হয়েছে, যখন থেকে পরমেশ্বর আছেন তখন থেকে আর্য্যাবর্তের জল বায়ুই তার পছন্দ হয়েছে। তিনি কখনো অন্য দেশে সফর করতেও চান না এবং ঐ হতভাগাদের তিনি খবরও নেন না; তিনি যেন তাদেরকে সৃষ্টি করার পর ভুলে গেছেন।

বন্ধুগণ! খোদার দোহাই। ভেবে দেখুন, এ সকল ধর্ম-বিশ্বাস কি মানব-প্রকৃতি গ্রহণ করতে পারে, না কোন বিবেক এতে সায় দিতে পারে? আমি বুঝতে পারি না এটা কি রকম বুদ্ধিমত্তা, একদিকে খোদাকে সারা বিশ্বের খোদা বলে স্বীকার করা হচ্ছে, আবার অন্যদিকে সেই মুখ দিয়ে এ কথাও বলা হচ্ছে তিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালন কাজ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছেন এবং কেবল একটি বিশেষ জাতি ও একটি বিশেষ দেশেই তাঁর কৃপা-দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। হে বিবেকবানেরা! তোমরা নিজেরাই বিচার কর, খোদার জড় প্রাকৃতিক বিধানে এর কোন সাক্ষ্য পাওয়া যায় কি? তাহলে তাঁর আধ্যাত্মিক বিধান কেন এরূপ পক্ষপাতিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে?

বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করলে প্রত্যেক কাজের ভাল মন্দ এর ফল থেকেও জানা যেতে পারে। অতএব বিভিন্ন শ্রেণীর কোটি কোটি মানুষ যে সকল সম্মানিত নবী ও রসূলের দাসত্ব ও আনুগত্যের শৃঙ্খলে বাঁধা আছে তাঁদেরকে গালি দেয়া ও অবমাননা করার ফল যে কি হতে পারে এবং অবশেষে এর কি ভীষণ পরিণাম হবে তা বর্ণনা করার আমার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা এমন কোন জাতি নেই যারা এরূপ পরিণামের কিছু না কিছু দেখে নি।

হে প্রিয় বন্ধুগণ! চিরকালের অভিজ্ঞতা ও বারবারের পরীক্ষা একথা প্রমাণ করে দিয়েছে, বিভিন্ন জাতির নবী ও রসূলগণকে অবমাননার সাথে স্মরণ করা ও তাঁদেরকে গালি দেয়া এরূপ এক বিষ, যা পরিণামে কেবল দেহকেই ধ্বংস করে না বরং আত্মাকেও ধ্বংস করে মানুষের ইহকাল ও পরকালকে বিনষ্ট করে দেয়। সেই দেশ শান্তিতে জীবন-যাপন করতে পারে না, যার অধিবাসীরা একে অন্যের ধর্মের পথ প্রদর্শকগণের দোষ খুঁজে বেড়ায় এবং তাঁদের সম্মানহানীর কাজে লিপ্ত থাকে। সেই সকল জাতিতে কখনো সত্যিকারের একতা আসতে পারে না, যাদের মধ্যে এক জাতি বা উভয় জাতি একে অন্যের নবী, ঋষি এবং অবতারগণের নিন্দা ও দুর্নাম করতে থাকে। নিজেদের নবী বা ধর্ম নেতার অবমাননার কথা শুনে কার না উত্তেজনা আসে? বিশেষতঃ মুসলমানরা এমন এক জাতি, যদিও তারা নিজেদের নবীকে খোদা বা খোদার পুত্র বানায় নি, তথাপি তারা তাঁকে (সঃ) ঐ সকল সম্মানিত মানুষ থেকে অধিক সম্মানিত মনে করে যাঁরা মাতৃগর্ভে জন্মে দেন। অতএব একজন খাঁটি মুসলমানের সাথে তার পবিত্র নবী সম্পর্কে আলোচনার সময় তাঁর জন্য সম্মানসূচক ও পবিত্র উক্তি ব্যবহার না করলে তার সাথে শান্তি স্থাপন করা কোন অবস্থাতেই সম্ভবপর হতে পারে না।

আমরা কখনো অন্য জাতির নবীগণের দুর্নাম করি না। বরং এটাই আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস, পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতিতে যত নবী এসেছেন এবং কোটি কোটি লোক তাঁদেরকে মেনে নিয়েছে এবং পৃথিবীর কোন অংশে তাঁদের ভালবাসা ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এ ভালবাসা ও বিশ্বাসের সুদীর্ঘকাল পার হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে এ একটি প্রমাণই তাঁদের সত্যতার জন্য যথেষ্ট। কেননা যদি তাঁরা খোদার পক্ষ থেকে না হোতেন তবে কোটি কোটি লোকের হৃদয়ে তাঁদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হতো না। খোদা তাঁর মনোনীত বান্দাগণের সম্মান কখনো অন্যকে দেন না। যদি কোন মিথ্যাবাদী তাঁদের আসনে বসতে চায় তাহলে শীঘ্রই তাকে ধ্বংস ও বিনাশ করে দেয়া হয়।

এরই ভিত্তিতে আমরা বেদকেও খোদার পক্ষ-থেকে অবতীর্ণ বলে বিশ্বাস করি এবং এর ঋষিদেরকে সম্মানিত ও পবিত্র মনে করি, যদিও আমরা দেখতে পাই বেদের শিক্ষা কোন সম্প্রদায়কেই পূর্ণরূপে খোদা-উপাসক করে গড়ে তুলতে পারে

নি এবং না গড়ে তুলতে পারতো। এ দেশে যে সকল লোককে মূর্তি-উপাসক বা অগ্নি-উপাসক বা সূর্য-উপাসক বা গঙ্গার পূজারী বা হাজার হাজার দেবতার পূজারী বা জৈন মতাবলম্বী বা শাক্ত মতাবলম্বীরূপে দেখতে পাওয়া যায়, তারা সকলে নিজেদের ধর্মকে বেদের প্রতিই আরোপ করে। আর বেদ এরূপ একটি দুর্বোধ্য গ্রন্থ যে, এ সকল সম্প্রদায় এর মধ্য থেকেই নিজ নিজ মতলবের কথা বের করে নেয়। তথাপি খোদার শিক্ষা অনুসারে আমাদের পাকা-পোক্ত বিশ্বাস হলো, বেদ খোদার নামে মানুষের বানানো গ্রন্থ নয়। কোটি কোটি মানুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করবার এবং স্থায়ী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা মানুষের বানানো গ্রন্থের থাকে না। যদিও আমরা বেদে কোথাও পাথর পূজার কথা পড়ি নি, কিন্তু নিঃসন্দেহে আগুন, বায়ু, জল, চাঁদ, সূর্য ইত্যাদির পূজার কথায় বেদ পূর্ণ রয়েছে এবং কোন শ্রুতিতেই (শ্লোকেই) এদের পূজা নিষিদ্ধ নয়। এখন কে এর মীমাংসা করবে, হিন্দুদের সকল প্রাচীন সম্প্রদায়ের মতবাদ মিথ্যা এবং আর্য্যদের নতুন সম্প্রদায়ের মতবাদই সত্য? আর যে সকল লোক বেদের বরাত দিয়ে এ সকল বস্তুর পূজা করে থাকে তাদের নিকট এ দৃঢ় প্রমাণ রয়েছে, এ সকল বস্তুর পূজার কথা বেদে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে এবং নিষেধ কোথাও নেই। এ সকল বস্তুর সবগুলোই যে পরমেশ্বরের নাম এরূপ বলা এক নিছক দাবী মাত্র। এখনো পরিষ্কারভাবে এর মীমাংসা হয় নি। মীমাংসাই যদি হতো তাহলে বারানসী এবং অন্যান্য শহরের বড় বড় পন্ডিতদের পক্ষে আর্য্যদের ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ না করার কোন কারণ দেখা যায় না। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের চেষ্টা সত্ত্বেও হিন্দুদের অতি অল্প লোকেই আর্য্য ধর্ম গ্রহণ করেছে। সনাতন ধর্ম ও অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় আর্য্য সমাজীদের সংখ্যা অতি নগণ্য। অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর এদের ব্যাপক কোন প্রভাবও নেই। তদ্রূপ 'নিয়োগ' এর যে শিক্ষা বেদের প্রতি আরোপ করা হয় তা-ও এমন এক ব্যবস্থা যা মানুষের আত্মমর্যাদাবোধ ও ভদ্রতা জ্ঞান কখনো গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু যেমন আমি এ মাত্র বলে আসলাম আমরা প্রকৃতপক্ষে একে বেদের শিক্ষা বলে স্বীকারই করতে পারি না বরং আমাদের শুভ ইচ্ছা আমাদেরকে একান্তভাবেই একথা বলতে বাধ্য করছে এ সকল শিক্ষা কোন পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পরবর্তীকালে বেদের প্রতি আরোপ করা হয়েছে। বেদের হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার দরুন এটাও সম্ভব যে, বিভিন্ন যুগে বেদের কোন কোন ভাষ্যকার বিভিন্ন প্রকারের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে থাকবে। অতএব আমাদের জন্য বেদের সত্যতার পক্ষে এ একটি প্রমাণই যথেষ্ট, আর্য্যাবর্তের কোটি কোটি লোক হাজার হাজার বছর ধরে একে খোদার বাণী বলে বিশ্বাস করে আসছে। আর এ সকল কথাকে কোন মিথ্যাবাদীর প্রতি আরোপ করা সম্ভবপর নয়।

এ সকল বাধা-বিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও আমরা খোদাকে ভয় করে বেদকে খোদার বাণী বলে বিশ্বাস করি এবং এর শিক্ষায় যে সকল ভ্রান্তি রয়েছে সেগুলোকে ভাষ্যকারদের

ভ্রান্তি বলে মনে করি। পক্ষান্তরে কুরআন শরীফ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র একত্ববাদে পূর্ণ। এর কোন জায়গায় সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতির পূজা করার শিক্ষা নেই। বরং সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, 'লা তাসজুদু লিশ্‌সামসে ওলা লিল্ কামারে ওয়াসজুদূ লিল্লাহিল্লাযী খালাকা হুন্না' (সূরা হামীম আস্ সাজ্‌দা)। অর্থাৎ সূর্যের পূজা করো না, চন্দ্রেরও পূজা করো না এবং অন্য কোন বস্তুরও পূজা করো না, বরং তাঁরই পূজা কর যিনি ওগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। এছাড়া কুরআন শরীফে খোদার প্রাচীন নিদর্শনাবলী ও তাজা নিদর্শনাবলী রয়েছে এবং এটা খোদার অস্তিত্ব দেখানোর জন্য এক আয়না বিশেষ। এতদ্‌সত্ত্বেও এর উপর (অর্থাৎ কুরআন শরীফের উপর- অনুবাদক) কেন ইতর হামলা করা হচ্ছে? এর ফল ভাল হবে বলে কি আশা করা যায়? কোন ব্যক্তি ফল দিলে তার উপর পাথর ছোঁড়া এবং কোন ব্যক্তি দুধ দিলে তার গায়ে পেশাব করে দেয়া কি সদ্ব্যবহার?

যদি এ ধরনের শান্তি স্থাপনের জন্য হিন্দু ও আর্য্যসমাজী মহাশয়গণ আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে খোদার সত্য নবী বলে মেনে নিতে প্রস্তুত হন এবং ভবিষ্যতে তাঁর অবমাননা করা ও তাঁকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করা পরিহার করেন তাহলে আমি সকলের পূর্বে এ অঙ্গীকারপত্রে দস্তখত করতে প্রস্তুত আছি, আমরা আহমদী সম্প্রদায়ের লোকেরা সর্বদা বেদের সত্যতা স্বীকার করবো এবং সম্মান ও ভালবাসার সাথে বেদ ও এর ঋষিদের নাম নেব। আর যদি এরূপ না করি তবে হিন্দু মহাশয়দের নিকট এ রকম এক বড় অঙ্কের অর্থদন্ড আদায় করবো, যা তিন লক্ষ টাকার কম হবে না। হিন্দু মহাশয়গণ যদি আন্তরিকতার সাথে পরিষ্কার মন নিয়ে এরূপ মিলনের জন্য প্রস্তুত হন, তবে তাঁরাও এরূপ অঙ্গীকারপত্র লিখে তাতে দস্তখত করে দিন। এর (অর্থাৎ অঙ্গীকার পত্রের- অনুবাদক) বক্তব্যও এ হবে যে, তাঁরা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সল্লামের রেসালত ও নবুওয়তে বিশ্বাস করেন এবং তাঁকে (সঃ) সত্য নবী ও রসূল মনে করেন এবং ভবিষ্যতে তাঁর নাম শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে উল্লেখ করবেন যেভাবে এক মান্যকারীর করা উচিত। আর যদি তারা এরূপ না করেন তবে এক বড় অঙ্কের অর্থ দন্ড আহমদী সম্প্রদায়ের নেতার নিকট আদায় করে দেবেন, যা তিন লক্ষ টাকার কম হবে না।

প্রকাশ থাকে যে, আমাদের আহমদী জামাতের লোক সংখ্যা এখন চার লক্ষের কম নয় (এ তথ্য ৯৪ বছর পূর্বেকার। বর্তমানে আহমদী জামাতের লোক সংখ্যা প্রায় ১৯ কোটি-অনুবাদক)। তাই এরূপ বড় কাজের জন্য তিন লক্ষ টাকার চাঁদা কোন বড় ব্যাপার নয়। যে সকল লোক (অর্থাৎ অ-আহমদী মুসলমান- অনুবাদক) এখনো আমাদের জামাতের বাইরে রয়েছে তারা সকলে প্রকৃতপক্ষে বিক্ষিপ্ত প্রকৃতি ও ধারণার বশবর্তী। তারা এমন কোন নেতার অধীন নয়, যার আনুগত্য করতে তারা বাধ্য। এজন্য আমি তাদের সম্পর্কে কিছুই বলতে পারি না। এখনতো তারা আমাকেই

কাফের ও দাজ্জাল সাব্যস্ত করছে। কিন্তু আমি আশা করি যখন হিন্দু মহাশয়গণ আমার সাথে এরূপ চুক্তি করবেন তখন এ সকল লোকও কখনো এরূপ অশোভন কর্মকান্ড করবে না যাতে এরূপ সভ্য জাতির ধর্মগ্রন্থ ও ঋষিদেরকে মন্দ বলে তারা আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে গালি খাওয়াবে। এরূপ গাল-মন্দের অপরাধ তো প্রকৃতপক্ষে ঐ লোকদের প্রতিই আরোপ করা হবে, যারা এ কর্মকান্ডের হোতা হবে। এরূপ কাজ যেহেতু শালীনতা ও ভদ্রতা বিরোধী, এ জন্য আমি আশা করি না এ চুক্তিপত্রের পর ঐ সকল লোক তাদের মুখ খুলবে। কিন্তু চুক্তি-পত্রকে পাকা করার জন্য উভয় পক্ষের দশ হাজার করে জ্ঞানী লোকের দস্তখত নেয়া জরুরী হবে।

প্রিয় বন্ধুগণ! শান্তির মত আর কিছুই নেই। চলুন, আমরা এ চুক্তিপত্রের মাধ্যমে এক হয়ে যাই ও এক জাতিতে পরিণত হই। আপনারা দেখছেন পরস্পরের প্রতি মিথ্যারোপ করার দরুন কত বিভেদের সৃষ্টি হয়েছে এবং দেশের কত ক্ষতি হয়েছে। আসুন, এখন এটাও পরীক্ষা করে দেখুন পরস্পরের সত্যতা স্বীকার করে নেয়ার মাঝে কত কল্যাণ নিহিত আছে। শান্তি স্থাপনের সব চেয়ে উত্তম উপায় এটাই। নতুবা অন্য কোন উপায়ে শান্তি স্থাপন এমনটিই হবে, যেমন একটি ফোঁড়াকে পরিষ্কার ও চকচকে দেখে এ অবস্থাতেই সেটাকে ছেড়ে দিয়ে তার বাহ্যিক চাকচিক্যে সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া। অথচ এর ভিতরে রয়েছে গলিত ও দুর্গন্ধযুক্ত পূঁজ।

এখানে আমার পক্ষে এ সব কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই। আজকাল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিদ্বেষ ও বিবাদ বেড়ে যাচ্ছে, তার কারণ কেবল ধর্মীয় মত পার্থক্যে সীমিত নয়, বরং অন্যান্য কারণও রয়েছে যা জাগতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বিষয়াদির সাথে সম্পৃক্ত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, প্রথম থেকেই হিন্দুগণ এ কামনা করে আসছেন যেন সরকার ও দেশের কাজে তাদের অধিকার থাকে বা অন্ততপক্ষে দেশের শাসন কাজে তাদের মতামত নেয়া হয়, তাদের প্রত্যেকটি অভিযোগ যেন সরকার মন দিয়ে শোনে এবং ইংরেজদের ন্যায় তারা যেন সরকারের বড় বড় পদ পায়। মুসলমানরা এ ভুল করেছিল, তারা হিন্দুদের এ প্রচেষ্টায় অংশ নেয় নি। তারা মনে করেছিল আমরা সংখ্যায় কম এবং ভেবেছিল এ সকল প্রচেষ্টার কোন ফল যদিও হয় তবে তা হিন্দুদের জন্যই হবে, মুসলমানদের জন্য নয়। এজন্য তারা কেবল অংশ গ্রহণ থেকে বিরতই থাকে নি বরং বিরোধিতা করে হিন্দুদের প্রচেষ্টায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এতে মনোমালিন্য এবং অসন্তোষও বেড়ে গেল।

আমি স্বীকার করি এ কারণগুলোর দরুনও মূল শত্রুতায় রং চড়ানো হয়েছে। কিন্তু আমি কখনো স্বীকার করি না, এগুলোই মূল কারণ। আমি ঐ সকল লোকের সাথে একমত নই, যারা বলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যকার শত্রুতা ও বিদ্বেষের কারণ ধর্মীয় ঝগড়া নয়, বরং আসল ঝগড়ার মূল কারণ রাজনৈতিক।

একথা প্রত্যেকেই সহজে বুঝতে পারে, মুসলমানেরা নিজেদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার দাবীর ক্ষেত্রে হিন্দুদের সহযোগী হতে কেন ভয় পায় এবং কেন আজ পর্যন্ত তারা কংগ্রেসে যোগদান করা থেকে অস্বীকার করে আসছে এবং কেন অবশেষে হিন্দুদের দাবীর যথার্থতা উপলব্ধি করে তাদের অনুসরণ করছে, কিন্তু তা তারা করেছে পৃথক হয়ে এবং তাদের (অর্থাৎ হিন্দুদের- অনুবাদক) প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে একটি মুসলমান সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং তাদের অংশীদারীত্ব গ্রহণ করে নি।

মহাশয়গণ! এর কারণ প্রকৃতপক্ষে ধর্মই। এছাড়া অন্য কিছু নয়। আজ যদি এ হিন্দুরাই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' কলেমা পড়ে মুসলমানদের সাথে কোলাকুলিতে আবদ্ধ হয়, অথবা মুসলমানরাই হিন্দু হয়ে বেদের আদেশ অনুযায়ী আগুন, বাতাস, ইত্যাদির পূজা করতে আরম্ভ করে এবং ইসলামকে বিদায় জানায় তাহলে যে সকল ঝগড়ার নাম এখন রাজনৈতিক ঝগড়া রাখা হয়েছে তা তৎক্ষণাৎ এভাবে শেষ হয়ে যাবে যেন তা কখনো ছিল না।

অতএব এথেকে বুঝা যায় সকল হিংসা-বিদ্বেষের মূল প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় মতভেদ। প্রাচীনকাল থেকেই যখন এ ধর্মীয় মতভেদ চরমে ওঠতে থাকে তখনই রক্তের নদী বইতে থাকে। হে মুসলমানেরা! যখন হিন্দুরা ধর্মীয় মতভেদের দরুন তোমাদেরকে ভিন্ন জাতি বলে মনে করে, তখন যতক্ষণ এর কারণ দূর না হবে তোমাদের ও তাদের মাঝে কেমন করে সত্যিকারের সৌহার্দ্য সৃষ্টি হতে পারে? হ্যাঁ, এটা সম্ভব, কপটভাবে কয়েকদিনের জন্য পরস্পরের মেলামেশা হতেও পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাকে আন্তরিকতা বলা যেতে পারে সে রকম আন্তরিকতা কেবলমাত্র তখন সৃষ্টি হতে পারে যখন আপনারা বেদ ও বেদের ঋষিদেরকে সরল অন্তকরণে খোদার পক্ষ থেকে এসেছে বলে স্বীকার করে নেবেন, আর তদ্রুপেই হিন্দুরাও যখন তাদের কার্পণ্য দূর করে আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নবুয়তকে সত্য বলে স্বীকার করে নেবেন। স্মরণ রেখো এবং খুব ভাল করে স্মরণ রেখো, তোমাদের ও হিন্দুদের মাঝে সত্যিকারের শান্তি স্থাপনের একমাত্র উপায় এটাই এবং এটাই এমন এক পানি, যা হৃদয়ের ময়লা ধুয়ে দেবে। যদি সেদিন আসে যেদিন এ দু'টি বিচ্ছিন্ন জাতি একে অন্যের সাথে মিলে যাবে তবে খোদা তাদের হৃদয়কেও সেই বিষয়ের জন্য খুলে দেবেন, যে বিষয়ের জন্য আমার হৃদয়কে তিনি খুলে দিয়েছেন।

কিন্তু এর সাথে হিন্দুদের প্রতি সত্যিকারের সহানুভূতি দেখানো আবশ্যক। সদ্ব্যবহার ও শিষ্টাচারের অভ্যাস কর। আর যে সকল কাজ আমাদের ধর্মে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য নয় ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় নয় অথচ তা হিন্দুদের মনে দুঃখ দেয় এ রকম কাজ থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখ। অতএব হিন্দুরা যদি আন্তরিকতার সাথে আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে সত্য নবী বলে মেনে নেয় ও তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাহলে 'গো-হত্যার' জন্য যে বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে তা-ও দূর

করা উচিত। যে সকল বস্তুকে আমরা 'হালাল' (বৈধ) বলে জানি তা ব্যবহার করতেই হবে এমনটি জরুরী নয়। এমন অনেক বস্তুই আছে যাকে আমরা 'হালাল' বলে জানি, কিন্তু আমরা কখনো তা ব্যবহার করি নি। খোদাকে এক ও অদ্বিতীয় মনে করা যেমন আমাদের ধর্মের আদেশ, তেমনি তাদের (অর্থাৎ হিন্দুদের) সাথে ভদ্র ও ভাল ব্যবহার করাও আমাদের ধর্মের অন্যতম আদেশ। অতএব একটা প্রয়োজনীয় ও হিতকর কাজের জন্য অপ্রয়োজনীয় কাজ ছেড়ে দেয়া ধর্ম ব্যবস্থার বিরোধী নয়। 'হালাল' মনে করা এক কথা এবং তা ব্যবহার করা অন্য কথা। ধর্ম হচ্ছে খোদার নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বিরত থাকা, তাঁর সন্তুষ্টির পথে দৌড়ানো, তাঁর সকল সৃষ্ট জীবের হিত ও কল্যাণ সাধন করা, তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো, পৃথিবীর সকল পবিত্র নবী ও রসূলকে তাঁদের নিজ নিজ সময়ে খোদার পক্ষ থেকে আগত নবী ও সংস্কারক বলে স্বীকার করা, তাদের মধ্যে তারতম্য না করা এবং মানব জাতির সেবা করা। এটাই আমাদের ধর্মের সার মর্ম। কিন্তু যারা খোদাকে ভয় না করে অন্যায়ভাবে আমাদের সম্মানিত নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে মন্দ ভাষায় উল্লেখ করে, তাঁর প্রতি অপবিত্র অপবাদ লাগায় এবং অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করা থেকে বিরত হয় না, তাদের সাথে আমরা কীভাবে সন্ধি করতে পারি? আমি সত্য সত্য বলছি, আমরা মরুভূমির সাপ ও জঙ্গলের বাঘের সাথে সন্ধি করতে পারি, কিন্তু আমরা তাদের সাথে সন্ধি করতে পারি না যারা আমাদের সেই প্রিয় নবীকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে, যিনি আমাদের প্রাণ ও মা-বাপের চেয়েও বেশি প্রিয়। খোদা আমাদেরকে ইসলামে মৃত্যু দিন। আমরা এরূপ কাজ করতে চাই না, যাতে ঈমান চলে যায়।

এখন আমি কোন জাতির প্রতি অযথা দোষারোপ করতে চাই না এবং কারো মনে কষ্ট দিতেও চাই না। বরং খুবিই আক্ষেপের সাথে আমাকে বলতে হচ্ছে, ইসলাম সেই পবিত্র ও শান্তি স্থাপনকারী ধর্ম, যা কোন জাতির ধর্মীয় নেতার উপর আক্রমণ করে নি এবং কুরআন সেই সম্মানযোগ্য গ্রন্থ, যা সব জাতির মাঝে শান্তির ভিত্তি স্থাপন করেছে ও প্রত্যেক জাতির নবীকে স্বীকার করেছে আর সারা বিশ্বে এ বিশেষ গৌরব কুরআন শরীফেরই প্রাপ্য, যা জগত সম্বন্ধে আমাদেরকে এ শিক্ষা দিয়েছে, 'লা নুফার্‌রিকো বাইনা আহাদিম্‌ মিনহুম ওনাহ্‌নু লাহু মুসলিমুন' অর্থাৎ হে মুসলমানেরা! তোমরা বল আমরা পৃথিবীর সব নবীকেই বিশ্বাস করি এবং তাঁদের মধ্যে এ পার্থক্য করি না যে কাউকে কাউকে স্বীকার করি ও কাউকে কাউকে প্রত্যাখ্যান করি। যদি এরূপ শান্তিকামী আর কোন ঐশী গ্রন্থ থেকে থাকে তবে তার নাম বল। কুরআন শরীফ খোদার সাধারণ অনুগ্রহকে বিশেষ কোন বংশে সীমাবদ্ধ করে নি। ইসরাঈল বংশীয় যত নবীই ছিলেন- ইয়াকুবই (আঃ) বল, ইসহাকই (আঃ) বল, মসীহ্‌ (আঃ) বল, দাউদই (আঃ) বল, আর ঈসাই (আঃ) বল, সকলের নবুওয়তকেই কুরআন শরীফ স্বীকার করে নিয়েছে; আর প্রত্যেক জাতির নবীকে, তিনি ভারতবর্ষেই গত হয়ে

থাকুন বা পারস্যেই, কাউকে প্রতারক ও মিথ্যাবাদী বলে নি, বরং সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে, প্রত্যেক জাতিতে ও দেশে নবী এসেছেন এবং সকল জাতির জন্য শান্তির ভিত্তি স্থাপন করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ শান্তির শিক্ষাদাতা নবীকে প্রত্যেক জাতি গালি দেয় এবং ঘৃণার চোখে দেখে।

হে প্রিয় স্বদেশবাসীগণ! আমি আপনাদেরকে দুঃখ বা মনে কষ্ট দেবার জন্য এ কথাগুলো আপনাদের নিকট বর্ণনা করি নি; বরং নিতান্ত সৎ উদ্দেশ্যে এ নিবেদন করতে চাই, যে সকল জাতি এ অভ্যাস গড়ে নিয়েছে এবং নিজেদের ধর্মে এ অন্যায় পন্থা অবলম্বন করেছে যে, তারা অন্য জাতির নবীগণকে কুবাক্য ও দুর্নামের সাথে উল্লেখ করে থাকে, তারা যে কেবল প্রমাণহীন অন্যায় চর্চা করে খোদার কাছে পাপী হচ্ছে তা নয়, বরং তারা মানব জাতির মাঝে বিদ্বেষ ও শত্রুতার বীজ বপন করার পাপেও পাপী হয়েছে। আপনারা বুকে হাত রেখে আমার এ কথার উত্তর দিন, যদি কোন ব্যক্তি কারো বাপকে গালি দেয় বা তার মায়ের প্রতি কোন অপবাদ লাগায়, তবে কি সে নিজ বাপের সম্মানের উপর আক্রমণ করে না? আর যাকে এরূপ গালি দেয়া হয়েছে, সে যদি উত্তরে তদ্রূপ গালি শুনিয়ে দেয় তবে কি এ কথা বলা অন্যায় হবে, প্রত্যুত্তরে গালি দেয়ার প্রকৃত কারণ সে ব্যক্তিই, যে প্রথম গালি দিয়েছিল এবং এ অবস্থায় সে নিজেই নিজের বাপ ও মায়ের সম্মানের শত্রু হবে।

খোদাতাআলা আমাদেরকে কুরআন শরীফে এত বেশি শিষ্টাচার ও সুনীতি শিখিয়েছেন যে, তিনি বলেন ঃ 'লা তাছোব্বুল্লাযীনা ইয়াদউনা মিন্ দুনিল্লাহে ফা ইয়াছোব্বুল্লাহা আদ্ওয়ায়ান বিগায়রে এলমিন্' (সূরা আনআম - ৭ম পারা), অর্থাৎ তোমরা মূর্তি উপাসকদের মূর্তিগুলোকেও গালি দিও না। তাহলে তারা তোমাদের খোদাকে গালি দিবে। কেননা তারা এ খোদাকে জানে না। এখন দেখ, খোদার শিক্ষার আলোকে মূর্তি কোন বস্তুই নয়, তথাপি খোদা মুসলমানদেরকে এ নীতি শিখাচ্ছেন যে, মূর্তিকে মন্দ বলা থেকেও বিরত থাক এবং বিনয়ের সাথে তাদেরকে বুঝাও, পাছে এমন না হয় যে, তারা ক্ষেপে গিয়ে খোদাকে গালি দিয়ে বসে এবং এ সকল গালির কারণ তোমরা না হয়ে পড়। অতএব এ সকল লোকের অবস্থা কতই শোচনীয় যারা ইসলামের এ মহিমান্বিত নবীকে গালি দেয়, অবমাননাকর ভাষায় তাঁকে উল্লেখ করে এবং ইতর পশু সুলভ পন্থায় তাঁর সম্মান ও চরিত্রের উপর আক্রমণ করে। যে সম্মানিত নবীর নাম উল্লেখ করা হলে ইসলামের পরাক্রমশালী বাদশাগণও সিংহাসন থেকে নেমে পড়েন এবং তাঁর আদেশের সামনে মাথা নত করে দেন ও নিজেদেরকে তাঁর নগণ্য দাসদের অন্তর্গত মনে করেন, তাঁর এ সম্মান খোদার পক্ষ থেকে নয় কি? খোদার দেয়া সম্মানের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা সেই সকল লোকের কাজ, যারা খোদার সাথে যুদ্ধ করতে চায়। হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম খোদার সেই মনোনীত রসূল, যাঁর সাহায্য ও সম্মান প্রকাশের জন্য খোদা

জগদ্বাসীকে বড় বড় নিদর্শন দেখিয়েছেন। এটা কি খোদার হাতের কাজ নয়, যাতে ২০ (বিশ) কোটি (বর্তমানে ১২০ একশত বিশ কোটি- অনুবাদক) মানুষের মস্তককে মুহাম্মদ (সঃ)-এর দরগায় নত করে রাখা হয়েছে? যদিও প্রত্যেক নবী তাঁর নবুওয়তের সত্যতার কিছু প্রমাণ রাখতেন, কিন্তু যে পরিমাণ প্রমাণ আঁ হযরত (সঃ)-এর সম্বন্ধে রয়েছে এবং আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হচ্ছে এর দৃষ্টান্ত কোন নবীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না।

আপনারা এ যুক্তিটি বুঝতে পারবেন না, যখন পৃথিবী পাপে কলুষিত হয়ে পড়ে এবং খোদার দাড়ি-পাল্লায় পাপ কাজ, কদাচার ও দুঃসাহসিকতা পুণ্য কাজের চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে যায় তখন কোন দাসকে পাঠিয়ে পৃথিবীর দুষ্কর্ম-বিশৃঙ্খলার সংশোধন করতে খোদার অনুগ্রহ উদ্বেলিত হয়ে উঠে। রোগ হলে চিকিৎসকের প্রয়োজন হয়। আর এ কথা বুঝার যোগ্যতা সবচেয়ে বেশি আপনাদের রয়েছে। কেননা আপনারা বলে থাকেন বেদ এরূপ সময়ে আসে নি যখন পাপের ঝড় বইছিল, বরং এমন সময়ে এসেছিল যখন পৃথিবীতে পাপের বন্যা ছিল না। অতএব যখন প্রত্যেক দেশে পাপের প্রবল বন্যা দ্রুত গতিতে চলছে তখন কোন নবীর আগমন কি আপনাদের দৃষ্টিতে যুক্তি-সঙ্গত নয়?

আমি আশা করি না যে, আপনারা এ ঐতিহাসিক ঘটনা জানেন না। আমাদের রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যখন রেসালতের মসনদকে তাঁর সত্তা দ্বারা সম্মানিত করলেন তখন ঐ যুগ এমন একটি অন্ধকার যুগ ছিল যে, পৃথিবীর সকল দেশই কদাচার ও কুবিশ্বাসে লিপ্ত ছিল। পন্ডিত দয়ানন্দ মহাশয় তার রচিত 'সত্যার্থ প্রকাশ' পুস্তকে লিখেছেন, তখন এ দেশ আর্য্যাবর্তেও খোদার উপাসনার স্থান মূর্তি উপাসনা দখল করে নিয়েছিল এবং বৈদিক ধর্ম অনেক বিকৃত হয়ে পড়েছিল।

তদ্রূপ 'মিজানুল হক' পুস্তকের লেখক খৃষ্ট ধর্মের একজন কঠোর সমর্থক ইংরেজ পাদ্রী ফন্ডেল তার এ পুস্তকে লেখেন, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগে সব জাতির মধ্যে সব চেয়ে বেশি বিকৃত হয়েছিল খৃষ্টান জাতি এবং তাদের দুষ্কর্ম খৃষ্ট ধর্মের জন্য লজ্জার কারণ হয়েছিল। আর স্বয়ং কুরআন শরীফও নিজের অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন 'জাহারাল ফাসাদু ফিল বারে ওয়াল বাহ্‌রে' (সূরা আর্ রূম - আয়াত ৪২) আয়াতে বর্ণনা করেছে। অর্থাৎ 'জল ও স্থল অনাচারে ছেয়ে গেছে'। এ আয়াতের মর্ম হচ্ছে, কোন জাতি অসভ্যই হোক বা সভ্যতার দাবী করুক, কেউ দুষ্কর্মমুক্ত ছিল না।

এ সকল সাক্ষ্য দ্বারাও প্রমাণিত হয়, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগের লোকেরা, তারা প্রাচ্যের হোক আর পাশ্চাত্যের হোক, তারা আর্য্যাবর্তের হোক আর আরবের মরুভূমির অধিবাসী হোক, বা তারা দ্বীপপুঞ্জেই বসবাস করুক, সকলেই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। এমন একজনও ছিল না, যার সাথে খোদার সম্পর্ক সঠিক

ছিল। দুষ্কর্ম পৃথিবীকে অপবিত্র করে দিয়েছিল। এরূপ অন্ধকার যুগেই কোন মহিমান্বিত নবীর আগমন আবশ্যক ছিল- একথা বুঝা কি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য কঠিন?

এখন প্রশ্ন এ থেকে যায়, এ নবী পৃথিবীতে এসে কি সংশোধন করেছেন? আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সংস্কার সম্বন্ধে একজন মুসলমান এ প্রশ্নের উত্তর যেরূপে দিতে পারে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি কোন খৃষ্টান, ইহুদী বা কোন আর্য্য সমাজী তেমন পরিষ্কার ও যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিতে পারে না।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল আরবদের সংস্কার করা। আরব জাতির অবস্থা সেই যুগে এমনটি ছিল যে, তাদেরকে মানুষ বলাই কঠিন ছিল। এমন কোন পাপ ছিল না যা তারা করতো না। এমন কোন পাপ ছিল না যা তাদের মাঝে প্রচলিত ছিল না। চুরি-ডাকাতি করা ছিল তাদের কাজ। যেভাবে পিঁপড়াকে পায়ের নীচে পিষে ফেলা হয়, সেভাবে মানুষকে হত্যা করা ছিল তাদের নিকট এক মামুলী কাজ। শিশুদেরকে হত্যা করে তারা তাদের ধন-সম্পদ গ্রাস করে ফেলতো। মেয়েদের জীবন্ত কবরে পুঁতে ফেলা হতো। ব্যভিচার করে তারা গর্ব করতো। শুধু কি তাই? এ সকল নোংরা কথা তাদের কবিতায় প্রকাশ করতো। মদ পান এ জাতিতে এত ব্যাপক ছিল যে, কোন ঘরই মদশূন্য ছিল না। জুয়া খেলায় তারা সব দেশকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। সকল ধরনের ইতরতায় তারা হিংস্র বন্য জন্তুদেরকেও হার মানিয়েছিল।

অতঃপর যখন আমাদের নারী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাদের সংস্কারের জন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর অভ্যন্তরীণ মনোনিবেশের দ্বারা তাদের হৃদয়কে শুদ্ধ করতে চাইলেন তখন অল্প কিছু দিনেই তাদের মাঝে এমন পরিবর্তনের সৃষ্টি হয়ে গেল যে তারা পশু থেকে মানুষ হয়ে গেল, অতঃপর মানুষ থেকে সভ্য মানুষ ও সভ্য মানুষ থেকে খোদাওয়ালা মানুষে পরিণত হলো। অবশেষে তারা খোদাতাআলার ভালভাসায় এরূপ মোহিত হয়ে গেল যে, তারা এক অনুভূতিহীন অঙ্গের ন্যায় সকল প্রকার দুঃখ সহ্য করলো। তাদেরকে সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট দিয়ে নির্যাতিত করা হলো। ভয়ানক নির্মমভাবে তাদেরকে বেত দিয়ে মারা হলো। তাদেরকে উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর শোয়ানো হলো ও বন্দী করা হলো। তাদেরকে ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত রেখে হত্যা করা হলো। কিন্তু তারা সব ধরনের বিপদের সময় সামনে এগিয়ে গেল। তাদের মাঝে এমন অনেক ছিল, যাদের সামনে তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করা হলো। তাদের মাঝে এমন অনেক ছিল, যাদের সন্তানদের সামনে তাদেরকে শূলবিদ্ধ করে হত্যা করা হলো। যে বিশ্বস্ততার সাথে তারা খোদার পথে প্রাণ দিয়েছিল তা চিন্তা করলেও কান্না আসে। যদি তাদের হৃদয়ে খোদার প্রভাব ও তাঁর নবীর মনোনিবেশের ক্রিয়া না থাকতো তবে তা কোন্ বস্তু ছিল, যা তাদেরকে ইসলামের

দিকে টেনে এনেছিল এবং এক অসাধারণ পরিবর্তন সৃষ্টি করে তাদেরকে এরূপ ব্যক্তির আস্তানায় লুটিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিল, যিনি অসহায়, দরিদ্র ও সহায় সম্বলহীন অবস্থায় মক্কার অলিতে গলিতে নির্জনে একলা ঘুরে বেড়াতেন? অবশ্যই কোন আধ্যাত্মিক শক্তি তাদেরকে অধঃপতিত অবস্থা থেকে উঠিয়ে উর্ধ্বে নিয়ে গিয়েছিল। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, তাদের অধিকাংশই অস্বীকারকারী অবস্থায় আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রাণের দুশমন ও রক্তের পিপাসু ছিল। অতএব আমিতো এর চেয়ে বড় কোন অলৌকিক নিদর্শন বুঝি না, কীভাবে একজন গরীব, নিঃস্ব, একক ও অসহায় ব্যক্তি তাদের হৃদয়কে সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পবিত্র করে নিজের দিকে টেনে আনলেন, এমনকি তারা তাদের আভিজাত্য ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভিক্ষুকের বেশে তাঁর সেবায় হাজির হয়ে গেল।

কোন কোন নির্বোধ ইসলামের বিরুদ্ধে জেহাদের অপবাদ আরোপ করে এবং বলে, এ সকল লোককে তলোয়ার দ্বারা জবরদস্তি মুসলমান করা হয়েছিল। আক্ষেপ, হাজার আক্ষেপ, এরা তাদের অবিচারে ও সত্য গোপনে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আক্ষেপ, এদের কি হয়েছে, এরা জেনে-শুনে সত্য ঘটনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আরব দেশে রাজা হিসাবে প্রকাশিত হন নি যে, তাঁর মধ্যে রাজকীয় প্রতাপ ও পরাক্রম থাকার দরুন লোকেরা জীবন বাঁচানোর জন্য তাঁর পতাকাতলে এসে গিয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

অতএব প্রশ্ন হলো, তিনি তাঁর দারিদ্র, অভাব-অনটন ও একাকীত্বের অবস্থায় খোদার একত্ব ও নিজের নবুওয়ত সম্পর্কে যখন আহ্বান জানাতে শুরু করেছিলেন তখন কোন্ তলোয়ারের ভয়ে লোকেরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল? আর যদি তারা ঈমান না নিয়ে থাকতো তবে তিনি তাদের উপর বল প্রয়োগের জন্য কোন্ রাজার নিকট থেকে সেনা বাহিনী চেয়েছিলেন ও সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন? হে সত্যান্বেষীরা! তোমরা নিশ্চিতরূপে জেনো, এ সকল কথা সেই সকল লোকের বানানো কথা যারা ইসলামের কঠোর দুশমন। ইতিহাস দেখ, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সেই অনাথ ছেলে, যার জন্মের কয়েক দিন পরেই (অর্থাৎ তিনি মায়ের পেটে আসার পরে পরেই- অনুবাদক) তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন এবং মা কেবল কয়েক মাসের শিশুকে ছেড়ে মারা গিয়েছিলেন। তখন ঐ শিশু, যার সাথে খোদার হাত ছিল, সে কারো সাহায্য ছাড়া খোদার আশ্রয়ে লালিত-পালিত হতে থাকলো। এ অসহায় ও অনাথ অবস্থায় তিনি কোন কোন লোকের ছাগলও চরিয়েছিলেন। আর খোদা ছাড়া তাঁর কোন অভিভাবক ছিল না। পঁচিশ বছর বয়সে পৌঁছার পরও তাঁর কোন চাচা তাঁকে নিজের মেয়ে দেন নি, কারণ বাহ্য দৃষ্টিতে তাঁর পরিবার প্রতিপালনের কোন ক্ষমতা ছিল না। তাছাড়া তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর এবং কোন শিল্প ও পেশা তিনি জানতেন না। অতঃপর যখন তাঁর বয়স ৪০ (চল্লিশ) বছরে পৌঁছল, তখন তাঁর হৃদয় সম্পূর্ণরূপে খোদার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়লো। হেরা

নামে একটি পর্বত-গুহা মক্কা থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। তিনি একা একা সেখানে যেতেন, গুহার ভিতর লুকিয়ে পড়তেন এবং তাঁর খোদাকে স্মরণ করতেন। একদিন সেই গুহায় তিনি গোপনে উপাসনা করছিলেন তখন খোদাতাআলা তাঁর উপর প্রকাশিত হলেন। আর তাঁকে আদেশ জানালেন, 'জগদ্বাসী খোদার পথ ছেড়ে দিয়েছে এবং পৃথিবী পাপে কলুষিত হয়ে পড়েছে। এজন্য আমি তোমাকে আমার রসূল মনোনীত করে পাঠাচ্ছি। এখন তুমি লোকদের সতর্ক কর, তারা যেন আমার শাস্তি আসার পূর্বে আমার দিকে ফিরে।' এ আদেশ শুনে তিনি ভয় পেলেন, আমি এক 'উম্মী' অর্থাৎ নিরক্ষর মানুষ। তিনি নিবেদন করলেন, 'আমি পড়তে জানি না।' তখন খোদা তাঁর বক্ষে সকল আধ্যাত্মিক জ্ঞান ভরে দিলেন এবং তাঁর হৃদয়কে আলোকিত করে দিলেন। তাঁর পবিত্র-করণ শক্তির প্রভাবে গরীব ও দুর্বল ব্যক্তিরা তাঁর আনুগত্যের আওতায় আসতে শুরু করে দিল। আর যারা বড় বড় ব্যক্তি ছিল তারা শত্রুতায় বদ্ধপরিকর হলো। এমনকি অবশেষে তারা তাঁকে হত্যা করতে চাইলো। কয়েকজন পুরুষ ও কয়েক জন স্ত্রীলোককে খুবই কষ্ট দিয়ে হত্যা করা হলো। আর শেষ হামলা এভাবে করা হলো, আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার জন্য তারা তাঁর ঘর ঘিরে ফেললো। কিন্তু যাকে খোদা বাঁচাবেন তাকে কে মারতে পারে? খোদা তাকে তাঁর ওহী (প্রত্যাদেশ বাণী) দ্বারা জানালেন, 'এ শহর থেকে বেরিয়ে পড় এবং আমি তোমার প্রতি পদক্ষেপে তোমার সাথে থাকবো।' অতএব তিনি আবূ বকর (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে মক্কা নগরী থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং তিন রাত 'সওর' নামক গুহায় লুকিয়ে রইলেন। শত্রুরা তাঁদের পিছু ধাওয়া করলো এবং পদচিহ্ন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে গুহা পর্যন্ত পৌছল। সে গুহা পর্যন্ত পায়ের চিহ্ন দেখিয়ে দিয়ে বললো, 'এ গুহায় তালাশ কর। এরপর আর কোন চিহ্ন নেই। আর যদি এরপরও কোথাও গিয়ে থাকে তবে আকাশে উঠে থাকবে।' কিন্তু কে খোদায়ী শক্তির বিস্ময়কর কার্যাবলীর কুল কিনারা করতে পারে? খোদা এক রাতেই নিজ মহিমা এভাবে প্রকাশ করলেন, মাকড়শা তার জাল বুনে গুহার মুখ বন্ধ করে দিল এবং এক কবুতরী গুহার মুখে বাসা বেঁধে ডিম পেড়ে বসলো। যখন পদচিহ্ন বিশেষজ্ঞ লোকদেরকে সেই গুহার ভিতরে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করছিল তখন এক বৃদ্ধ বললো, 'এ পদ-চিহ্ন বিশেষজ্ঞতো পাগল হয়ে গেছে। আমিতো এ জালকে গুহার মুখে সেই যুগ থেকে দেখে আসছি যখন মুহাম্মদ (সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম) এর জন্মই হয় নি।' এ কথা শুনে সকলে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং গুহার প্রসঙ্গ ছেড়ে দিল।

অতঃপর আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম গোপনে মদীনায় পৌছলেন এবং মদীনার অধিকাংশ লোক তাঁকে গ্রহণ করে নিল। এতে মক্কাবাসীদের ক্রোধ জ্বলে উঠলো। তারা আক্ষেপ করলো, আমাদের শিকার আমাদের হাত ছাড়া হয়ে গেল। অতঃপর তারা দিন রাত এ ষড়যন্ত্র করতে লাগলো কীভাবে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু

আলায়হে ওয়া সাল্লামকে হত্যা করা যায়। যে অল্প সংখ্যক লোক মক্কায় আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিল, তারাও মক্কা থেকে হিজরত করে বিভিন্ন দেশে চলে গিয়েছিল। কেউ কেউ আবিসিনিয়ার রাজার আশ্রয় নিয়ে নিয়েছিল। আর কেউ কেউ মক্কাতেই থেকে যায়। কেননা সফরের জন্য তাদের নিকট পথ খরচ ছিল না। তাদেরকে অনেক কষ্ট দেয়া হলো। এরা কেমন করে দিন রাত ফরিয়াদ করতো তা কুরআন শরীফে বর্ণিত রয়েছে।

অতঃপর অস্বীকারকারী কোরেশদের অত্যাচার সীমা ছেড়ে গেল। তারা গরীব স্ত্রীলোকদেরকে ও অনাথ শিশুদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করলো। কোন কোন স্ত্রীলোককে এরূপ নির্মমভাবে হত্যা করা হলো যে, তাদের দু'পা দড়ি দিয়ে দু' উটের সাথে বেঁধে সেই উট দু'টোকে বিপরীত দিকে দৌড়ানো হলো। আর এভাবে ঐ সকল স্ত্রীলোক দু'টুকরো হয়ে মরে গেল।

যখন নিষ্ঠুর কাফেরদের অত্যাচার এতদূর পর্যন্ত পৌছলো তখন সেই খোদা, যিনি অবশেষে নিজ বান্দাদের প্রতি করুণা করেন, তিনি নিজ রসূলের প্রতি ওহী অবতীর্ণ করলেন, 'অত্যাচারিতদের ফরিয়াদ আমার নিকট পৌছে গেছে। আজ আমি অনুমতি দিচ্ছি তোমরাও তাদের মোকাবেলা কর। আর স্মরণ রেখো, যারা নিরপরাধ লোকদের উপর তলোয়ার উঠায় তাদেরকে তলোয়ার দিয়েই ধ্বংস করা হবে। কিন্তু তোমরা সীমালংঘন করো না। কেননা খোদা সীমালংঘনকারীকে ভালবাসেন না।'

এটাই হলো ইসলামী জেহাদের প্রকৃত তাৎপর্য। এটাকে নিতান্ত অন্যায়ভাবে বিকৃত করে বর্ণনা করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে খোদা (শাস্তি প্রদানে) ধীর। কিন্তু যখন কোন জাতির দুষ্কর্ম সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন তিনি অত্যাচারীকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়েন না এবং তিনি তাদের জন্য ধ্বংসের উপকরণ সৃষ্টি করে দেন। আমি জানি না আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা কোথা থেকে এবং কার কাছ থেকে শুনেছে, ইসলাম তলোয়ারের জোরে প্রসার লাভ করেছে। খোদাতো কুরআন শরীফে বলেন, 'লা ইকরাহা ফিদ্দীনে'। অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে জবরদস্তি নেই। তাহলে কে জবরদস্তির আদেশ দিল এবং জবরদস্তির কোন্ উপকরণই বা ছিল আর যাদেরকে জোর করে মুসলমান করা হয় তাদের ধর্ম বিশ্বাস ও নিষ্ঠা কি এতখানি হতে পারে যে তারা বিনা বেতনে ও দু' তিন শ' হওয়া সত্বেও যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষের মুখোমুখি হয়? যখন তাদের সংখ্যা হাজার হয় তখন তারা কয়েক লক্ষ দুশমনকে পরাজিত করে দেয়। আর তারা ধর্মকে দুশমনের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য ভেড়া ও ছাগলের ন্যায় জীবন দিয়ে দেয় এবং নিজেদের রক্ত দিয়ে ইসলামের সত্যতার উপর মোহর লাগিয়ে দেয়। আর খোদার একত্বের প্রসারের জন্য এরূপ উদ্বুদ্ধ হয় যে, সন্ন্যাসীদের ন্যায় কঠোর ক্লেশ বরণ করে আফ্রিকার মরুভূমি পর্যন্ত পৌছে যায় এবং সে দেশে ইসলামকে প্রসারিত করে দেয়। তারা সব ধরনের কষ্ট স্বীকার করে চীন পর্যন্ত পৌছে

এবং যোদ্ধারূপে নয় বরং সন্ন্যাসীরূপে এসব দেশে পৌঁছে ইসলামের দিকে মানুষকে আহ্বান জানায়। এর ফল এ হলো, তাদের কল্যাণময় প্রচারে এ দেশে কয়েক কোটি লোক মুসলমান হয়ে যায়। অতঃপর চট পরিধানকারী দরবেশ হিসাবে তারা ভারতবর্ষে আসে ও আর্য্যাবর্তের অনেক অংশে ইসলাম দিয়ে মানুষকে ধন্য করে দেয় এবং ইউরোপের সীমা পর্যন্ত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' এর আওয়াজ পৌঁছিয়ে দেয়। তোমরা ধর্মতঃ বল, এ কাজ কি ঐ সকল লোকের যাদেরকে জোর করে মুসলমান বানানো হয় এবং হৃদয়ে তারা অস্বীকারকারী ও মুখে মুসলমান? না, বরং এটা সেই সকল লোকের কাজ, যাদের হৃদয় ঈমানের জ্যোতিতে পূর্ণ ও যাদের হৃদয়ে খোদা ছাড়া আর কিছু থাকে না।

আবার আমি এ দিকে ফিরে আসছি, ইসলামের শিক্ষা কী? প্রকাশ থাকে, ইসলামের মহান উদ্দেশ্য খোদার একত্ব ও প্রতাপ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা, শেরেকের মূল উপড়ে ফেলা এবং বিভিন্ন জাতিকে এক কলেমার উপর প্রতিষ্ঠিত করে তাদেরকে এক জাতিতে পরিণত করা। পূর্বে যে সকল ধর্ম পৃথিবীতে গত হয়েছে এবং যত নবী-রসূল এসেছিলেন, তাঁদের দৃষ্টি কেবল তাঁদের জাতি ও তাঁদের দেশ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। যদি তাঁরা কিছু নীতি-আদর্শ শিখিয়েও থাকেন, তবে তা দ্বারা কেবল তাদের জাতির কল্যাণ সাধন করা ছাড়া সেগুলার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। বস্তুতঃ হযরত মসীহ্ (আঃ) সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, 'আমার শিক্ষা শুধু বনী ইসরাঈলীদের মাঝে সীমাবদ্ধ।' যখন একজন স্ত্রীলোক, যে ইসরাঈল বংশীয় ছিল না, একান্ত বিনয়ের সাথে তাঁর কাছে উপদেশ চেয়েছিল তখন তিনি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর ঐ নিরীহ মহিলা নিজেকে কুকুরীর সাথে তুলনা করে উপদেশ প্রার্থনা করলো। তখনো তাকে সেই একই উত্তর দেয়া হলো, 'আমাকে কেবল ইসরাঈলের হারানো মেষদের জন্য পাঠানো হয়েছে।' অবশেষে সেই মহিলা চুপ হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কোথাও বলেননি, আমি কেবল আরবদের জন্য প্রেরিত হয়েছি। বরং কুরআন শরীফে এ কথা বলা হয়েছে, 'কুল ইয়া আয়্যুহান্নাসো ইন্নী রসূলুল্লাহে ইলায়কুম জামিয়া।' অর্থাৎ 'লোকদেরকে বলে দাও, আমি সমগ্র পৃথিবীর জন্য প্রেরিত হয়েছি।' কিন্তু স্মরণ রেখো, হযরত ঈসা (আঃ)-এর সেই স্ত্রীলোকটিকে পরিষ্কারভাবে ফিরিয়ে দেয়া এমন কাজ ছিল না, যাতে হযরত ঈসা (আঃ)-এর কোন পাপ ছিল। কারণ সর্ব সাধারণকে ধর্ম শিখাবার সময় তখনো আসে নি। আর হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি খোদাতাআলার পক্ষ থেকে এ আদেশই ছিল 'তোমাকে শুধু বনী ইসরাঈলের জন্য পাঠানো হয়েছে। অন্যদের প্রতি তোমার কোন কর্তব্য নেই।' অতএব এটাই সত্য যা আমি এইমাত্র বর্ণনা করলাম যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর নৈতিক শিক্ষা কেবল ইহুদীদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। ব্যাপারটি হলো, তওরাতে এ আদেশ ছিল, দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে

নাক।' আর এ শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল এটাই ছিল যেন ইহুদীদের মধ্যে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং অত্যাচার ও সীমালংঘন থেকে তাদেরকে বিরত করা যায়। কারণ চারশ' বছর দাসত্বে থাকার ফলে তাদের মাঝে নানা ধরনের জুলুম ও হীনতার স্বভাব জন্ম নিয়েছিল। যেহেতু প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের স্বভাবে কঠোরতার উদ্ভব হয়েছিল, তাই খোদার প্রজ্ঞার তাকিদ এটাই ছিল যে, তাদের স্বভাবের এ কঠোরতা দূর করার জন্য অন্য এক কঠোর নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন। অতএব সেই নৈতিক শিক্ষাই হচ্ছে ইঞ্জিল। এটা কেবল ইহুদীদের জন্যই ছিল, সারা পৃথিবীর জন্য নয়। কেননা অন্যান্য জাতির সাথে হযরত ঈসা (আঃ)-এর কোন সম্পর্ক ছিল না।

কিন্তু বাস্তব সত্য এটাই, হযরত ঈসা (আঃ) যে শিক্ষা দিয়েছেন এর ত্রুটি কেবল এটাই নয় যে, এ শিক্ষা জগতের সাধারণ সহানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং এ শিক্ষার আরো একটি ত্রুটি হলো তওরাত যেভাবে কঠোরতা ও প্রতিশোধের শিক্ষায় বাড়াবাড়ির দিকে বেশি জোর দিয়েছে, সেখাবে ইঞ্জিলও ক্ষমা আর বিনয়ের শিক্ষায় বাড়াবাড়ির দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এ দুটো গ্রন্থই মানবতা-বৃক্ষের সব শাখার প্রতি লক্ষ্য রাখে নি। বরং এ বৃক্ষের একটি শাখা তওরাত পেশ করছে এবং অন্য শাখা ইঞ্জিল দেখিয়েছে। দু'টো শিক্ষাই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। কেননা সব সময় ও সকল অবস্থায় যেমন প্রতিশোধ গ্রহণ করা ও শাস্তি দেয়া যুক্তিসঙ্গত নয়, তেমনিই সকল সময় ও সকল অবস্থায় ক্ষমা করা ও বিনয় দেখানো মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে একেবারে প্রতিকুল। এ জন্য কুরআন শরীফ এ দু'টো শিক্ষাকে নাকচ করে দিয়ে বলছে, 'জাযাও সাইয়েয়াতিন সাইয়েয়াতম্ মিসলোহা ফামান আফা ওআসলাহা ফা আজরোহু আলাল্লাহে' (সূরা আশ্ শূরা - আয়াত ৪১)। অর্থাৎ অন্যায়ের প্রতিশোধ ততটুকু হবে যতটুকু অন্যায় করা হয়েছে। এটা তওরাতেরও শিক্ষা। কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষমা করবে (যেমন ইঞ্জিলের শিক্ষা), তার ক্ষমা সে অবস্থায় শুভ ও সঙ্গত হবে যখন এর ফল শুভ হয় এবং যাকে ক্ষমা করা হয় সেই ক্ষমায় যেন তার সংশোধনের উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। অন্যথায় আইন তা-ই, যা তওরাতে বর্ণিত রয়েছে।

(সমাপ্ত)

নিম্নে ঐ সকল নোট উদ্ধৃত করা হচ্ছে, যা হযরত আকদস (আঃ) এ প্রবন্ধ (অর্থাৎ পয়গামে সুলেহ্ – অনুবাদক) সম্পর্কে লিখেছিলেন। তাঁর পাণ্ডুলিপি থেকে পাওয়া গেছে।

কুরআন শরীফের যে সকল আয়াত ইনশাআল্লাহ্ এ প্রবন্ধে লেখা হবে ঃ

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

(অর্থ ঃ ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নেই। (কারণ) সৎপথ ও ভ্রান্তির মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে- অনুবাদক) (সূরা আল্ বাকারা আয়াত ২৫৭)।

إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ

(অর্থ ঃ যদি তোমরা সদকাহ্ প্রকাশ কর তবে তা ভাল; যদি তোমরা সদকাহ্ গোপন কর, তবে তা খুবই ভাল। এরূপ সদকাহ্ তোমাদের অনিষ্টসমূহ দূর করে দিবে - অনুবাদক) (সূরা আল্ বাকারা, আয়াত ২৭২) ।

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

(অর্থ ঃ যারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাতে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, তাদের জন্য তাদের প্রভু-প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার সংরক্ষিত রয়েছে, এবং তাদের কোন ভয় নেই ও তারা মর্মাহতও হবে না- অনুবাদক) (সূরা আল্ বাকারা, আয়াত ২৭৫) ।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

(অর্থ ঃ আর যখন আমার বান্দারা আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তখন (বল), আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথ পায়-অনুবাদক) (সূরা আল্ বাকারা, আয়াত ১৮৭)।

যেন তাদের মঙ্গল হয়। আমার আদেশসমূহ মেনে চলা ও আমার প্রতি ঈমান আনা তাদের উচিত, যাতে তাদের মঙ্গল হয়।

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

(অর্থ ঃ তোমরা ভালবাসাপূর্ণ হৃদয়ে খোদাকে স্মরণ কর, যেভাবে তোমরা তোমাদের বাপদাদাদেরকে স্মরণ কর) (সূরা আল্ বাকারা, আয়াত ২০১)।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ۝

(অর্থ ঃ কেউ কেউ এমন আছে, যারা নিজেদেরকে খোদার পথে বিক্রি করে দেয়, যাতে কোনভাবে তিনি সন্তুষ্ট হন (সূরা আল্ বাকারা, আয়াত ২০৮)।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

(অর্থ ঃ হে ঈমানদারেরা! খোদার পথে নিজেদের ঘাড় পেতে দাও এবং শয়তানের পথ অবলম্বন করো না। কেননা শয়তান তোমাদের শত্রু। এখানে শয়তান বলতে ঐ সকল লোককেই বুঝায়, যারা মন্দ কাজের শিক্ষা দেয় (সূরা আল্ বাকারা, আয়াত ২০৯)।

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ

(অর্থ ঃ তোমরা তোমাদের শপথের জন্য আল্লাহ্কে লক্ষ্যস্থল বানিও না- অনুবাদক) (সূরা আল্ বাকারা, আয়াত ২২৫)।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ

(অর্থ ঃ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা দানের খোঁটা দিয়ে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দানকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় ব্যর্থ করো না, যে নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং সে আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না। তার দৃষ্টান্ত ঐ মসৃণ শক্ত পাথরের অবস্থার ন্যায়, যার উপর অল্প মাটি রয়েছে, অতঃপর সেটার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হয় এবং সেটাকে পরিষ্কার শক্ত পাথররূপেই রেখে যায়- অনুবাদক(সূরা আল্ বাকারা, আয়াত ২৬৫)।

কুরআন শরীফে এ বিশেষ আদেশ রয়েছে, এর নৈতিক শিক্ষা সারা জগতের জন্য। কিন্তু ইঞ্জিলের নৈতিক শিক্ষা কেবল ইহুদীদের জন্য।

নোট ঃ কুরআন মজীদের এ সকল হাওয়ালা (রেফারেন্স) সম্ভবতঃ হুযূর আলায়হেস সালাম যখন পয়গামে সুলেহ্ লিখছিলেন তখন তাঁর নিকট ছিল। (কামাল উদ্দীন)।

কুরআন শরীফ অন্যান্য ধর্মের লোকদের সৎ কাজেরও যে প্রশংসা করে সে সম্পর্কে ঃ

لَيْسُوْا سَوَآءً ؕ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ۝ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

(অর্থ ঃ তারা সকলে সমান নয়। আহলে কিতাবের মাঝে এমন একদলও আছে যারা (তাদের অঙ্গীকারে) কায়েম আছে, তারা রাতের বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পড়ে এবং তারা তাঁর সামনে সেজদা করে। তারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, এবং ন্যায়-সঙ্গত কাজের আদেশ দেয় ও অসঙ্গত কাজ হতে বারণ করে এবং পুণ্য কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করে। আর এরাই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত - অনুবাদক) (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১৪-১১৫)।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا۟ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾ هَٰٓأَنتُمْ أُو۟لَآءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَٰبِ كُلِّهِۦ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ عَضُّوا۟ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا۟ بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿١١٩﴾

(অর্থ ঃ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিজেদের লোকদেরকে ছেড়ে অন্যদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না; তারা তোমাদের ক্ষতি সাধনে কোন ক্রুটি করবে না। তারা চায় যেন তোমরা কষ্টে পড়ে যাও। তাদের মুখ থেকে বিদ্বেষ প্রকাশিত হয়েছে এবং যা তাদের বক্ষ গোপন রাখছে তা আরো গুরুতর। যদি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাও (তবে দেখবে) আমরা তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি। শুন! তোমরা এমন লোক, তোমরা তো তাদেরকে ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদেরকে ভালবাসে না, আর তোমরা সকল কিতাবের প্রতি ঈমান রাখ। এবং যখন তারা তোমাদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, 'আমরা ঈমান আনি,' আর যখন তারা পৃথক হয় তখন তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রোশে আঙ্গুলের অগ্রভাগ কামড়াতে থাকে। তুমি বল, 'তোমরা তোমাদের আক্রোশে মরে যাও, নিশ্চয় তোমাদের বক্ষে যা কিছু নিহিত আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ বিশেষভাবে অবহিত – অনুবাদক) (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১৯-১২০)।

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٤٩﴾

(অর্থ ঃ তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করেছ যারা নিজদেরকে পবিত্র বলে দাবী করে? বরং আল্লাহ্ যাকে চান পবিত্র করেন, এবং তাদের উপর খেজুর বীজের ঝিল্লী পরিমাণও জুলুম করা হবে না- অনুবাদক) (সূরা আল্ নিসা, আয়াত ৫০)।

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

(অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন, তোমরা আমানতসমূহকে ওগুলোর প্রাপককে ফিরিয়ে দাও, আর যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার কর তখন

ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করো। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যার উপদেশ দিচ্ছেন নিশ্চয় তা অতি উত্তম। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা – অনুবাদক)(সূরা আল্ নিসা, আয়াত ৫৯)।

ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মীমাংসা ছিল এর সম্পর্কে।

مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

(অর্থ ঃ যে সৎ (কাজের) সুপারিশ করবে, তার জন্য তা থেকে এক অংশ থাকবে, আর যে মন্দ (কাজের) সুপারিশ করবে, তার জন্য ওটার তুল্য অংশ থাকবে, এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান – অনুবাদক) (সূরা আন্ নিসা, আয়াত ৮৬)।

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

(অর্থ ঃ এবং কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে তার প্রতিফল হবে জাহান্নাম, যাতে সে বসবাস করতে থাকবে। আর আল্লাহ্ তার প্রতি ক্রোধ বর্ষণ করবেন এবং তিনি তাকে অভিসম্পাত করবেন ও তার জন্য মহা আযাব প্রস্তুত করবেন – অনুবাদক) (সূরা আন্ নিসা, আয়াত ৯৪)।

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

(অর্থ ঃ এবং যে তোমাদেরকে সালাম বলে, তাকে বলোনা তুমি মো'মেন নও – অনুবাদক) (সূরা আন্ নিসা, আয়াত ৯৫)।

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا

(অর্থ ঃ এবং ধর্মের ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কে অধিক উত্তম হতে পারে, যে আল্লাহ্‌র নিকট পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করে এবং সে সৎকর্মপরায়ণ হয় ও সত্যনিষ্ঠ ইব্‌রাহীমের ধর্মাদর্শের অনুসরণ করে? – অনুবাদক) (সূরা আন্ নিসা, আয়াত ১২৬)।

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

(অর্থ ঃ আর আপোষ-মীমাংসা উত্তম – অনুবাদক) (সূরা আন্ নিসা, আয়াত ১২৯)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

(অর্থ ঃ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য সাক্ষী হিসাবে ন্যায়-পরায়ণতার

উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও, যদিও (তোমাদের সাক্ষ্য) তোমাদের নিজেদের বা তোমাদের পিতামাতার বা স্বজনদের বিরুদ্ধেই যায় – অনুবাদক) (সূরা আন্ নিসা, আয়াত ১৩৬)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن
يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾

(অর্থ ঃ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি এবং এই কিতাবের প্রতি যা তিনি তাঁর রসূলের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন এবং সেই কিতাবের প্রতিও যা তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন, আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর ফিরিশ্‌তাদেরকে, তাঁর কিতাবসমূহকে, তাঁর রসূলদেরকে ও শেষ দিবসকে অস্বীকার করে সে অবশ্যই চরমভাবে পথভ্রষ্ট হলো – অনুবাদক)(সূরা আন্ নিসা, আয়াত ১৩৭)।

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ
وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

(অর্থ ঃ তোমরা বল, 'আমরা ঈমান রাখি আল্লাহ্র প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি নাযেল করা হয়েছে এবং যা ইব্রাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও (তার) বংশধরদের প্রতি নাযেল করা হয়েছিল এবং যা কিছু মূসা ও ঈসাকে দেয়া হয়েছিল এবং যা কিছু অন্য সকল নবীকে তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিল তার প্রতিও (ঈমান রাখি)। আমরা তাদের কারো মধ্যে তারতম্য করিনা, এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী – অনুবাদক) (সূরা আল্ বাকারা, আয়াত ১৩৭)।

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ

তোমরা যেভাবে ঈমান এনেছ যদি তারা সেভাবে ঈমান আনে, তবে তারা হেদায়াত পেয়েছে। আর যদি তারা এভাবে ঈমান না আনে তবে তারা এরূপ জাতি, যারা বিরোধিতা ছাড়তে চায়না ও আপোষ-মীমাংসা চায় না। (সূরা আল্ বাকারা, আয়াত ১৩৮)

رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

(অর্থ ঃ রসূলদেরকে সুসংবাদ বহনকারী ও সতর্ককারীরূপে (পাঠিয়েছি), যেন রসূলদের (আসার) পর মানবজাতির জন্য আল্লাহ্র বিরুদ্ধে কোন ওযর-আপত্তি না থাকে। আর আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময় – অনুবাদক) (সূরা আন্ নিসা, আয়াত ১৬৬)।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٥١﴾

(অর্থ ঃ নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলদেরকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলদের মধ্যে তারতম্য সৃষ্টি করতে চায় এবং বলে, 'আমরা কারো কারো প্রতি ঈমান আনি ও কাউকে কাউকে অস্বীকার করি', এবং তারা চায় যেন তারা এর মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করে; এরাই প্রকৃত অস্বীকারকারী এবং আমরা অস্বীকারকারীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক আযাব প্রস্তুত করে রেখেছি – অনুবাদক) (সূরা আন্ নিসা, আয়াত ১৫১-১৫২)।

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ

(অর্থ ঃ এবং তিনি তোমাদের জন্য অবশ্যই এ কিতাব নাযেল করেছেন, যখন তোমরা শুন আল্লাহ্র আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে ও সেগুলোর প্রতি বিদ্রূপ করা হচ্ছে তখন তাদের সাথে বসো না – অনুবাদক) (সূরা আন্ নিসা, আয়াত ১৪১)।

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾

(অর্থ ঃ কেনইবা আল্লাহ্ তোমাদেরকে আযাব দিবেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং ঈমান আন? নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞ– অনুবাদক) (সূরা আন্ নিসা, আয়াত ১৪৮)।

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ

(অর্থ ঃ নিশ্চয় মরিয়মের পুত্র ঈসা মসীহ্ আল্লাহ্র এক রসূল মাত্র এবং তাঁর বাণী (এর প্রতিশ্রুতি পূর্ণকারী) ছিল যা তিনি মরিয়মের প্রতি নাযেল করেছিলেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে একটি রূহ্ (রহমত) ছিল; সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন এবং বলোনা, '(আল্লাহ্) তিন।' তোমরা এরূপ কথা থেকে বিরত হও। এটা তোমাদের জন্য উত্তম – অনুবাদক) (সূরা আন্ নিসা, আয়াত ১৭২)।

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

(অর্থ ঃ – আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহকে সম্পূর্ণ করলাম, আর ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম – অনুবাদক) (সূরা আল্ মায়েদা, আয়াত ৪)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

(অর্থ ঃ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সাক্ষী হিসাবে ন্যায়-পরায়ণতার উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও এবং কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদেরকে আদৌ এ অপরাধ করতে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায় বিচার না কর। তোমরা সুবিচার কর, এটা তাক্‌ওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আর তোমরা যা করছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ বিশেষভাবে অবহিত – অনুবাদক) (সূরা আল্ মায়েদা, আয়াত ৯)।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ

(অর্থ ঃ আল্লাহ্ নিশ্চয় সুবিচার ও উপকার করবার ও আত্মীয় স্বজনকে (দান করবার ন্যায় অন্য লোকদেরকেও) দান করবার আদেশ দিচ্ছেন – অনুবাদক) (সূরা আন্ নাহল, আয়াত ৯১)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

(অর্থ ঃ হে যারা ঈমান এনেছ! মদ, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্য নির্ধারণকারী তীর একান্ত অপবিত্র শয়তানী কার্য-কলাপের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তোমরা এগুলোকে বর্জন কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পার – অনুবাদক) (সূরা আল্ মায়েদা, আয়াত ৯১)।

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

(অর্থ ঃ তুমি বল, 'যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস তাহলে তোমরা আমার অনুসরণ কর; আল্লাহ্‌ও তোমাদেরকে ভালবাসবেন' – অনুবাদক) (সূরা আলে 'ইমরান, আয়াত ৩২)।

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

(অর্থ ঃ তুমি বল, 'নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সব কিছুই আল্লাহ্‌র জন্য যিনি বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক – অনুবাদক) (সূরা আল্ আন 'আম, আয়াত ১৬৩)।

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝

(অর্থ ঃ সুতরাং যে একে (অর্থাৎ আত্মাকে) পবিত্র করেছে সে অবশ্যই সফলকাম হয়েছে এবং যে একে (মাটিতে) গেড়ে দিয়েছে সে অকৃতকার্য হয়েছে – অনুবাদক) (সূরা আশ্ শাম্‌স, আয়াত ১০-১১)।

وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى

(অর্থ ঃ যে ব্যক্তি ইহজগতে অন্ধ থাকবে, সে পরজগতেও অন্ধ হবে – অনুবাদক) (সূরা সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৭৩)।

وَهُوَ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ حَتّٰٓى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّهٖ ۚ وَالَّذِيْ خَبُثَ لَا يَخْرُجُ اِلَّا نَكِدًا ۚ كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّشْكُرُوْنَ ۝

(অর্থ ঃ এবং তিনি সেই সত্তা, যিনি নিজ দয়ার পূর্বে সুসংবাদ দেয়ার জন্য বাতাসকে পাঠান, এমনকি তা ভারী মেঘ বহন করে, তখন আমরা তাকে কোন মৃত অঞ্চলের দিকে চালাই; অতঃপর তা থেকে পানি বর্ষণ করি, অতঃপর তা দিয়ে সকল প্রকার ফল-ফলাদি উৎপন্ন করি। এভাবে আমরা মৃতদেরকে বের করি যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। আর যে অঞ্চল উত্তম, তার প্রভু-প্রতিপালকের আদেশে তাতে (প্রচুর) উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়; কিন্তু যা নিকৃষ্ট, তা থেকে কেবল অকেজো জিনিষ উৎপন্ন হয়। এভাবেই আমরা কৃতজ্ঞ জাতির জন্য নিদর্শনাবলী সবিস্তারে বর্ণনা করি – অনুবাদক) (সূরা আল্ আ'রাফ, আয়াত ৫৮-৫৯)।

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّآ اَخَذْنَآ اَهْلَهَا بِالْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ۝

এবং আমরা কখনো এমন কোন জনপদে, তার অধিবাসীদেরকে তাদের অস্বীকারের দরুন অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্ট দ্বারা পাকড়াও করা ছাড়া কোন নবী পাঠাইনি, যেন তারা বিনয়ে অবনত হয় (সূরা আল্ আ'রাফ, আয়াত ৯৫)।

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوْا وَّقَالُوْا قَدْ مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَاَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

(অর্থ ঃ অতঃপর আমরা (তাদের) মন্দ অবস্থাকে ভাল অবস্থায় বদলিয়েছিলাম, যে পর্যন্ত না তারা (ধনে-জনে) বেড়ে গিয়েছিল; তখন তারা বলতে লাগলো, আমাদের বাপ-দাদাদের উপর সুখ ও দুঃখ আসতো (আমাদের জন্য এটা নুতন কিছু নয়)। অতএব অকস্মাত আমরা তাদেরকে এমতাবস্থায় পাকড়াও করলাম যে তারা বুঝতেও পারে নি – অনুবাদক) (সূরা আল্ আ'রাফ, আয়াত ৯৬)।

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

(অর্থ ঃ এবং যদি সেই সকল শহরের অধিবাসীরা ঈমান আনতো ও তাক্ওয়া অবলম্বন করতো তাহলে আমরা নিশ্চয় তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দুয়ার খুলে

দিতাম, কিন্তু তারা (নবীগণকে) মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করলো। সুতরাং তারা যা অর্জন করে আসছিল তার জন্য আমরা তাদেরকে পাকড়াও করলাম – অনুবাদক) (সূরা আল্ আ'রাফ, আয়াত ৯৭)।

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾

(অর্থ ঃ এ সকল শহরের অধিবাসীরা কি এ বিষয়ে নিরাপদ হয়ে গেছে যে, তাদের উপর আমাদের শাস্তি রাতেও আসতে পারে যখন তারা ঘুমিয়ে থাকবে? অথবা এ সকল শহরের অধিবাসীরা কি এ বিষয়ে নিরাপদ হয়েছে যে, তাদের উপর আমাদের শাস্তি সকাল বেলাও আসতে পারে যখন তারা খেলা-ধূলায় মত্ত থাকবে? – অনুবাদক) (সূরা আল্ আ'রাফ, আয়াত ৯৮-৯৯)।

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا
النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

অর্থাৎ ঐ সকল কাজের আদেশ দেয়, যা বিবেক-বুদ্ধির পরিপন্থী নয়। আর ঐ সকল কাজ নিষেধ করে, যা বিবেক-বুদ্ধিও নিষেধ করে। এবং পবিত্র বস্তুকে বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তুকে অবৈধ সাব্যস্ত করে। আর জাতির ঘাড় থেকে ঐ বোঝা নামিয়ে দেয়, যার নীচে তারা চাপা পড়ে ছিল। এবং ঘাড়ের ঐ বেড়ি থেকে তাদেরকে মুক্তি দেয়, যার দরুন ঘাড় সোজা করা যেতো না। অতএব যারা এর প্রতি ঈমান আনবে এবং নিজেরা অংশ নিয়ে একে শক্তিশালী করবে ও একে সাহায্য করবে, আর এ জ্যোতির অনুসরণ করবে যা এর সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, তারা ইহকাল ও পরকালের দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে (সূরা আল্ আ'রাফ, আয়াত ১৫৮)।

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

(অর্থ ঃ তুমি বল, হে মানবজাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্‌র রসূল – অনুবাদক) (সূরা আল্ আ'রাফ, আয়াত ১৫৯)।

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾

এবং যারা কিতাবকে মযবুতভাবে ধরে আছে ও নামায কায়েম করে. আমরা তাদের পুরস্কার বিনষ্ট করি না (সূরা আল্ আ'রাফ, আয়াত ১৭১)।

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ

(অর্থ ঃ আমি কি তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক নই? তারা বললো, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি – অনুবাদক) (সূরা আল্ আ'রাফ, আয়াত ১৭৩)।

মানবাত্মায় যে শক্তিগুলো দেয়া হয়েছে তা রূহের শক্তি, যাতে খোদাতাআলার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছে তারা খোদার হাতেই সৃষ্ট হয়েছে।

অতএব যদি এ প্রশ্ন করা হয় আমরা কীরূপে কুরআন শরীফের প্রতি ঈমান আনবো, কেননা দু'টি শিক্ষার মাঝে বিরোধ রয়েছে? এর উত্তর হলো, কোন বিরোধ নেই। হাজারোভাবে বেদের শ্লোকসমূহের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এগুলোর মাঝে একটি ঐ ব্যাখ্যাও রয়েছে, যা কুরআন শরীফ অনুযায়ী করা হয়েছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۳۰﴾

অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ! যদি তোমরা তাক্ওয়া (আল্লাহ্র প্রতি ভয়, ভক্তি, ভালবাসা -অনুবাদক) অবলম্বন কর তবে তোমাদের মধ্যে ও অন্যদের মধ্যে খোদা এক পার্থক্য সৃষ্টি করে দেবেন, আর তোমাদেরকে পবিত্র করবেন ও তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন। এবং তোমাদের খোদা মহা অনুগ্রহের অধিকারী (সূরা আল্ আনফাল, আয়াত ৩০)।

اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗۤ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ

অর্থ ঃ কেবল মুত্তাকীরাই এর (প্রকৃত) তত্ত্বাবধায়ক- অনুবাদক) (সূরা আল্ আনফাল, আয়াত ৩৫)

যদি আপোষ-মীমাংসার সময় হৃদয়ে ধোঁকাবাজী থাকে তবে এই ধোঁকাবাজীর প্রতিকারের জন্য খোদাই তোমার জন্য যথেষ্ট।

اَلَا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْۤا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوْا بِاِخْرَاجِ الرَّسُوْلِ وَهُمْ بَدَءُوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ اَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۳﴾

(অর্থ ঃ তোমরা কি সেই জাতির সাথে যুদ্ধ করবে না যারা তাদের শপথ ভঙ্গ করেছে ও রসূলকে নির্বাসিত করার সংকল্প করেছে এবং তারাই তোমাদের বিরুদ্ধে (সংঘর্ষের) সূচনা করেছে? তোমরা কি তাদেরকে ভয় কর? যদি তোমরা মু'মিন হও তাহলে (জেনে রাখ) আল্লাহ্ই অধিক যোগ্য, তোমরা তাঁকে ভয় করো – অনুবাদক) (সূরা আত্তাওবা, আয়াত ১৩)।

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ِۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۲۴﴾

(অর্থ ঃ তুমি বল, তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়রা এবং যে ধন-সম্পদ তোমরা অর্জন করেছ ও ব্যবসা-বাণিজ্য, যার মন্দাকে তোমরা ভয় কর এবং বাগানসমূহ যা তোমরা ভালবাস, (এ সব কিছু) যদি আল্লাহ্

এবং তাঁর রসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা তোমাদের নিকট বেশী প্রিয় হয় তাহলে তোমরা অপেক্ষা কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাঁর মীমাংসা প্রকাশ করেন; আর আল্লাহ্ দুষ্কর্ম পরায়ন জাতিকে হেদায়াত দান করেন না – অনুবাদক) (সূরা আত্তাওবা, আয়াত ২৪)।

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ

(অর্থ ঃ এবং তাদের জন্য দোয়া কর; নিশ্চয় তোমার দোয়া তাদের জন্য শান্তিদায়ক – অনুবাদক) (সূরা আত্তাওবা, আয়াত ১০৩)।

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾

ঐ সকল লোক সফলকাম; যারা সব কিছু ছেড়ে দিয়ে খোদার দিকে ফিরে, খোদার উপাসনায় মগ্ন হয়ে যায়, খোদার প্রশংসায় লেগে থাকে, খোদার পথে আহবান জানাতে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়, খোদার সামনে ঝুঁকতে থাকে ও সেজদা করে। এরাই মু'মিন, যাদেরকে পরিত্রাণের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে (সূরা আত্তাওবা, আয়াত ১১২)।

> যে ব্যক্তি খোদাকে ভয় করেনা সে এক সত্য বিষয়ে এরূপ এক মোকাবেলার আচরণ করে যেন তা তাকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিতে চায় আর সে তার প্রাণ রক্ষা করছে।

নোট ঃ ধর্ম কেবল মুখের গল্প-কাহিনী নয়। বরং যেভাবে সোনাকে তার চিহ্নাবলী দ্বারা সনাক্ত করা হয়, সেভাবে খাঁটি হেদায়াতের অনুসারী তার আলো প্রকাশ করে।

খোদা ঐ ব্যক্তিকে ধ্বংস করেন, যে যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা ধ্বংস হয়েছে এবং ঐ ব্যক্তিকে জীবিত রাখেন, যে যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা জীবিত।

টীকা ঃ

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ

যদি বিরুদ্ধবাদীরা শান্তির দিকে ঝুঁকে তাহলে তুমিও ঝুঁকে যাও এবং খোদার উপর ভরসা কর (সূরা আল্ আনফাল, আয়াত ৬২)।

وَاِنْ يُّرِيْدُوْۤا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ۗ هُوَ الَّذِيْۤ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾

(অর্থ ঃ আর তারা যদি তোমাকে ধোঁকা দিতে চায় তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমার জন্য যথেষ্ট, তিনিই নিজ সাহায্য দ্বারা এবং মু'মিনদের দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করবেন – অনুবাদক) (সূরা আল্ আনফাল, আয়াত ৬৩)।

খোদা তাঁর প্রাকৃতিক বিধানে বিপদকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন, অর্থাৎ বিপদের চিহ্নাবলী যা ভয় দেখায়, অতঃপর বিপদের মধ্যে পা রাখা। অতঃপর এরূপ অবস্থা যখন সৃষ্টি হয় (এটা ঠিকভাবে পড়া যায় নি- কামাল উদ্দীন), অতঃপর বিপদের অন্ধকার যুগ, অতঃপর খোদার দয়ার প্রাতঃকাল। এটা পাঁচটি সময়, যার দৃষ্টান্ত হচ্ছে পাঁচ নামায।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝

(অর্থ ঃ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা কেন তা বল যা করন ? আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত ঘৃণিত, তোমরা তা বল যা কর না -অনুবাদক) (সূরা আস্ সাফ্ফ, আয়াত ৩-৪)।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ

(অর্থ ঃ আর ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে, যে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে ?- অনুবাদক) (সূরা আল্ আন'আম, আয়াত ২২)।

নিম্নে কতিপয় আপত্তি ও কতিপয় সত্য লিপিবদ্ধ করা হলো, যা হুযূর আলায়হেস সালামের নোট থেকে আমি পেয়েছি। এ নোট তিনি পয়গামে সুল্হ সম্পর্কে লিখেছিলেন। এ সকল আপত্তি খন্ডন করা এবং কুরআনের শিক্ষার আলোকে সেই সকল সত্যের উপর আলোকপাত করা তাঁর ইচ্ছা ছিল। তেমনি বুদ্ধের কোন কোন বিষয় তিনি একটি পুস্তক থেকে সংগ্রহ করেছিলেন বলে মনে হয়। এ পুস্তকটি তিনি সেই সময় পড়া-শুনা করছিলেন এবং এটি সম্পর্কে তিনি কিছু লিখতে চেয়েছিলেন। (কামাল উদ্দিন)

(১) যত ঐশী গ্রন্থ রয়েছে তাতে এরূপ কোন্ নূতন কথা আছে. যা পূর্বে জানা ছিল না?

(২) নবীগণ বিজ্ঞানের এরূপ কোন্ সমস্যার সমাধান করেছেন, যা পূর্বে সমাধান করা হয় নি?

(৩) নবীগণ আত্মার ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছুই বলেন নি, না তাঁরা পরকালের জীবনের অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলেছেন, না তাঁরা খোদার বিস্তারিত অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পেরেছেন। কিন্তু নবীগণ বর্ণনা করেছেন, ঘুমের অন্যান্য কারণ রয়েছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ঘুমের স্বাভাবিক কারণ রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৪) (নবীগণ) পূর্বের ভুল-ভ্রান্তিসমূহ দূর করেন নি, না জটিল সমস্যাসমূহের সমাধান দিয়েছেন, বরং আরো জটিলতার সৃষ্টি করেছেন।

(৫) বুদ্ধের নৈতিক শিক্ষাই সব সবচেয়ে মোক্ষম।

(৬) মানুষ যে বস্তুকে ভালবাসে, যদি তাকে তা থেকে পৃথক করে দেয়া হয় তবে এটাই তার জন্য এক শাস্তি হয়ে যায়।

(৭) মানুষ যে বস্তুকে ভালবাসে, যদি সে তা পায় তবে তাই তার স্বস্তির কারণ হয়।

وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ

(অর্থ ঃ আর তাদের মধ্যে ও তারা যা চাইতো তার মধ্যে বাধা সৃষ্টি করা হবে – অনুবাদক) (সূরা সাবা, আয়াত ৫৫) ।

(৮) কামনা-বাসনা বিনাশ করা পরিত্রাণের উপায়।

(৯) পৃথিবীতে কখনো কখনো সঠিক জ্ঞান দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করা যায়। আর কখনো কখনো সঠিক কাজ-কর্ম দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করা যায়। আর কখনো কখনো সঠিক কথা দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করা যায়। আর কখনো কখনো সঠিক ক্রিয়া দ্বারা পরিত্রাণ লাভ করা যায়। আর কখনো কখনো মানুষের সাথে ভাল আচরণ পরিত্রাণের কারণ হয়ে যায়। আর কখনো কখনো খোদার সাথে সম্পর্ক দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেয়। আর কখনো কখনো একটি বেদনা অন্যান্য বেদনার জন্য প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়।

(১০) সত্য বল, মিথ্যা বলো না। আজে বাজে কথা বলা থেকে বিরত থাক। আর নিজের কাজ বা নিজের কথা দ্বারা কারো ক্ষতি করো না। নিজের জীবনকে পবিত্র রাখ। পরনিন্দা করো না। এবং কারো উপর অপবাদ লাগিও না। প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে নিজের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে দিও না। হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বিরত থাক। প্রতিহিংসা থেকে নিজের হৃদয় মুক্ত রাখ। নিজের দুশমনের সাথেও ঐ আচরণ করো না, যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর না। এরূপ উপদেশ অন্যকে দিওনা, যা তুমি নিজেই অনুসরণ কর না। তত্ত্বজ্ঞানের উন্নতিতে লেগে থাকো। অজ্ঞতা থেকে হৃদয়কে মুক্ত কর। কারো বিরুদ্ধে তাড়াহুড়া করে আপত্তি উত্থাপন করো না।

ঘৃণা দ্বারা ঘৃণা দূর করা যায়না, বরং তা আরো বেড়ে যায়। ভালবাসা ঘৃণাকে দূর করে দেয়।

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى

অর্থাৎ ঃ হৃদয়ের পবিত্রতা হচ্ছে আসল কুরবানী। মাংস ও রক্ত আসল কুরবানী নয়। যে স্থলে সাধারণ লোকেরা পশু কুরবানী করে, সে স্থলে বিশেষ লোকেরা হৃদয়কে জবাই করে (সূরা আল্ হাজ্জ্, আয়াত ৩৮)।

কিন্তু খোদা এ সকল কুরবানীও বন্ধ করেন নি, যাতে বুঝা যায় এ সকল কুরবানীও মানুষের সাথে সম্পৃক্ত।

খোদা বেহেশ্‌তের সৌন্দর্যাবলী এ আঙ্গিকে বর্ণনা করেছেন, যা আরবের লোকদের নিকট পছন্দের বস্তু ছিল। খোদা তা-ই বর্ণনা করেছেন যাতে তাদের হৃদয় এ দিকে ঝুঁকে যায়। প্রকৃতপক্ষে সেই সকল বস্তু ভিন্ন কিছু, এ সকল বস্তু নয়। কিন্তু এরূপ বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল যাতে হৃদয়কে আকৃষ্ট করা হয়।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ

(অর্থ ঃ মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত – অনুবাদক) (সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ১৬)।

যে নিজের প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা পূর্ণ করতে লেগে থাকে, সে সরাসরি নিজের মূল উপড়িয়ে ফেলে। কিন্তু যে সঠিক পথে চলে, তার কেবল দেহই নয় বরং আত্মাও পরিত্রাণ লাভ করবে।

যে নিজের কামনা-বাসনা পূর্ণ করতে লেগে থাকে, সে সরাসরি নিজের মূল উপড়িয়ে ফেলে এবং সে কেবল নিজের দেহকেই বিনাশ করে না, বরং আত্মাকেও বিনাশ করে। কিন্তু যে সঠিক পথে চলে এবং প্রবৃত্তির তাড়নার অনুসারী হয় না, সে কেবল তার দেহকেই ধ্বংস থেকে রক্ষা করে না, বরং নিজের আত্মাকেও পরিত্রাণ পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়।

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۝

(অর্থ ঃ সুতরাং যে একে (অর্থাৎ আত্মাকে) পবিত্র করেছে সে অবশ্যই সফলকাম হয়েছে, আর যে একে (মাটিতে) গেড়ে দিয়েছে সে অকৃতকার্য হয়েছে - অনুবাদক) (সূরা আশ্ শাম্‌স, আয়াত ১০-১১)।

এক গ্রামে এক শত ঘর ছিল। মাত্র একটি ঘরে প্রদীপ জ্বলতো। যখন লোকেরা একথা জানতে পারলো তখন তারা নিজ নিজ প্রদীপ নিয়ে আসলো এবং সকলে ঐ প্রদীপ থেকে নিজেদের প্রদীপ জ্বেলে নিল। এভাবে একটি আলো থেকে অনেক আলো হতে পারে। এদিকেই আল্লাহ্‌তালা ইঙ্গিত করে বলেন,

وَدَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۝

(অর্থ ঃ এবং আল্লাহ্‌র আদেশ অনুযায়ী তাঁর দিকে আহবানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে- অনুবাদক) (সূরা আল্ আহযাব, আয়াত ৪৭)।

মানুষতো তার প্রাণেরও মালিক নয়। তার ধন-সম্পদের মালিক হওয়ার প্রশ্নই আসে না। চামচ শরবতের স্বাদ পায় না যদিও তাতে কয়েকবার তা পড়ুক না কেন। তবে হাতের মাধ্যমে শরবতের মিষ্টি স্বাদ মুখ পর্যন্ত পৌছে। কিন্তু হাত মিষ্টির স্বাদ পায় না। এভাবেই যাকে খোদা অনুভূতি শক্তি দেন নি সে মাধ্যম হয়েও কোন উপকার লাভ করে না।

اَللّٰهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ

(অর্থ ঃ আল্লাহ্ সব চেয়ে বেশী জানেন তাঁর রিসালত কোথায় দিবেন - অনুবাদক) (সূরা আল্ আন'আম, আয়াত ১২৫)।

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۝

(অর্থ ঃ তারা বধির, মুক ও অন্ধ; সুতরাং তারা ফিরবেনা - অনুবাদক) (সূরা আল্ বাকারা, আয়াত ১৯)।

একটি বড় স্বাদ ছোট স্বাদ থেকে মুক্ত করে দেয়, যেমন আল্লাহ্‌তাআলা বলেন,

أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۝

(অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে - অনুবাদক) (সূরা আর্ রা'দ, আয়াত ২৯)। وَلَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ (অর্থ ঃ আর নিশ্চয় আল্লাহ্‌র যিক্‌র (স্মরণ) হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ (পুণ্য) - অনুবাদক) (সূরা আল্ আন্‌কাবুত, আয়াত ৪৬)।

(১) ঈমান হচ্ছে বীজ। (২) পুণ্য কাজ হচ্ছে বৃষ্টি। (৩) সাধ্য-সাধনা হচ্ছে লাঙ্গল, যা দৈহিক ও বাহ্যিকভাবে চালানো হয়। নফ্‌স (অর্থাৎ আত্মা) হচ্ছে লাগামহীন বলদ। তা হচ্ছে 'নফ্‌সে আম্মারা' (অর্থাৎ অবাধ্য আত্মা)। একে চালানোর জন্য শরীয়ত হচ্ছে লাঠি। আর এর দ্বারা যে শাক-সব্জি উৎপন্ন হয়, তা চিরস্থায়ী জীবন।

সে-ই তার সত্তা থেকে বেরিয়ে যায়, যার মধ্যে উত্তম গুণাবলী থাকে না। কেননা মানুষের উত্তম গুণাবলীই তার সত্তা। নিজ হৃদয়ের আবেগকে বুঝতে পারে, এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। সে যে সকল বস্তুতে তার স্বাচ্ছন্দ্য দেখতে পায়, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে তার স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ হয় না।

যে ব্যক্তি অন্যায়ের মোকাবেলায় অন্যায় করে না এবং ক্ষমা করে, সে নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু এর চেয়েও বেশি প্রশংসার যোগ্য সেই ব্যক্তি, যে ক্ষমা বা প্রতিশোধের নাগপাশে আবদ্ধ নয়। বরং সে খোদার হয়ে সময়োচিত কাজ করে। কেননা খোদাও প্রত্যেকের অবস্থা অনুযায়ী কাজ করেন। যে শাস্তির যোগ্য তিনি তাকে শাস্তি দেন এবং যে ক্ষমার যোগ্য তাকে ক্ষমা করেন।

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ

অর্থ ঃ (স্মরণ রেখো) মন্দের প্রতিফল এর অনুরূপ মন্দ এবং যে ব্যক্তি ক্ষমা করে ও সংশোধন করে তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র জিম্মায়- অনুবাদক) (সূরা আশ্‌ শূরা, আয়াত ৪১)।

পৃথিবীতে দুটো শ্রেণীর লোক অনেক রয়েছে। একটি হলো তারা, যারা ন্যায় বিচার পছন্দ করে। আর দ্বিতীয়টি হলো তারা, যারা দয়াকে সুদৃষ্টিতে দেখে। আর তৃতীয় শ্রেণীটি হলো তারা, যাদের উপর প্রকৃত সহানুভূতি এতখানি প্রাধান্য লাভ করে যে তারা ন্যায়-বিচার ও দয়ার অনুসারী থাকে না, বরং তারা প্রকৃত সহানুভূতির দরুন সময়োচিত কাজ করে, যেভাবে মা তার শিশু সন্তানের সাথে আচরণ করে থাকে। মা তাকে সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবারও দিয়ে থাকে, আবার সময়োচিত তিতা ঔষধও দিয়ে থাকে। আর উভয় অবস্থাতেই তার (এখানেও লেখা ছুটে গেছে - কামাল উদ্দিন)।

আমার বর্ণনায় এমন কোন কথা থাকবে না, যা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যাবে। আমরা এ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ। কেননা আমরা তাদের নিকট থেকে নিরাপত্তা ও শান্তি পেয়েছি। আমি আমার দাবী সম্পর্কে এতখানি বর্ণনা করা জরুরী মনে করি যে, আমি আমার পক্ষ থেকে নই, বরং খোদার মনোনয়নে প্রেরিত হয়েছি যেন আমি সব ভুল-ত্রুটি দূর করি, এবং জটিল সমস্যাসমূহের সমাধান করি ও ইসলামের আলো অন্যান্য জাতিকে দেখাই। স্মরণ থাকে যে, আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা যেভাবে ইসলামের এক বিকৃত চেহারা দেখাচ্ছে, তা ইসলামের চেহারা নয়। বরং ইসলাম এরূপ একটি উজ্জ্বল হিরক, যার প্রতিটি কোনা দ্যুতি ছড়াচ্ছে। একটি বড় প্রাসাদে অনেক প্রদীপ রয়েছে এবং কোন প্রদীপ কোন তাক্‌ থেকে দেখা যাবে এবং কোনটি কোন্‌ থেকে দেখা যাবে। এটাই ইসলামের অবস্থা যে, এর স্বর্গীয় জ্যোতিঃ কেবল এক দিক্‌ থেকেই দেখা যায় না, বরং প্রত্যেক দিক্‌ থেকেই এর অনাদি প্রদীপ দৃশ্যমান। এর শিক্ষা স্বয়ং এক প্রদীপ। আর এর সাথে খোদার সাহায্যের যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সেই প্রত্যেকটি নিদর্শন হচ্ছে প্রদীপ। আর যে ব্যক্তি এর সত্যতা প্রকাশের জন্য খোদার পক্ষ থেকে আসেন, তিনিও একটি প্রদীপ। আমার

জীবনের বড় অংশ বিভিন্ন জাতির কিতাব দেখায় কেটে গেছে। কিন্তু সত্য সত্য বলছি, আমি অন্য কোন ধর্মের শিক্ষাকে কুরআন শরীফের বর্ণনার সমকক্ষ দেখতে পাই নি, সেটা এর বিশ্বাসের অংশই হোক, নৈতিক অংশই হোক, আধ্যাত্মিক উন্নতির ধাপ হোক, সমাজ ব্যবস্থা হোক, বা সেটা এর সৎ কাজের শ্রেণী বিভাগের অংশই হোক। আমি একজন মুসলমান বলে একথা বলছি না বরং সত্যের খাতিরে আমি এ সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হচ্ছি। আর আমি এ সাক্ষ্য অসময়ে দিচ্ছি না। বরং এমন সময় এ সাক্ষ্য দিচ্ছি যখন পৃথিবীতে ধর্মের কুস্তি শুরু হয়েছে। আমাকে জানানো হয়েছে, এ কুস্তিতে পরিণামে ইসলাম জয়ী হবে। আমি জমীনের কথা বলছি না। কারণ আমি জমীন থেকে নই। বরং আমি তা-ই বলছি, যা খোদা আমার মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন। পৃথিবীর লোক মনে করে থাকবে, সম্ভবতঃ পরিণামে খৃষ্ট ধর্ম পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে, বা বৌদ্ধ ধর্ম পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভ করবে। তাদের এ ধারণা ভুল। স্মরণ রেখো, পৃথিবীতে কোন বিষয় ঘটে না যতক্ষণ পর্যন্ত তা আকাশে স্থির না হয়। অতএব আকাশের খোদা আমাকে বলেছেন, অবশেষে ইসলাম ধর্ম মানুষের হৃদয় জয় করবে। ধর্মের এ যুদ্ধে আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে আমি যেন আদেশ অন্বেষণকারীদেরকে সতর্ক করি। আমার দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে এক বিপজ্জনক ডাকাত দলের সংবাদ দিচ্ছে, যারা এক গ্রামের অধিবাসীদের উদাসীনতার অবস্থায় তাদের উপর ডাকাতি করতে চায়। অতএব যে ব্যক্তি তার কথা শুনে সে তার ধন-সম্পদ ঐ ডাকাত দলের হাত থেকে রক্ষা করে নেয়। আর যে শুনে না তাকে ধ্বংস করা হয়। আমাদের এ যুগে দু'ধরনের ডাকাত রয়েছে। কেউ কেউ আসে বাইরের পথ দিয়ে, আর কেউ কেউ ভিতরের পথ দিয়ে। আর তারাই মারা যায়, যারা নিজেদের ধন-সম্পদ নিরাপদ জায়গায় রাখে না। এ যুগে ঈমানী ধন-সম্পদ রক্ষা করার জন্য নিরাপদ জায়গা হলো, ইসলামের সৌন্দর্যাবলী সম্পর্কে জানতে হবে, ইসলামের আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পর্কে জানতে হবে, ইসলামের অলৌকিক জীবন্ত নিদর্শনাবলী সম্পর্কে জানতে হবে এবং ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে হবে, যাকে ইসলামী মেষগুলোর জন্য রাখালরূপে নিযুক্ত করা হয়। কেননা পুরাতন নেকড়ে বাঘ এখনো জীবিত আছে। সে মরে নি। সে যে মেষকে এর রাখাল থেকে দূরে দেখতে পায় সে অবশ্যই একে নিয়ে যাবে।

হে খোদার বান্দাগণ! আপনারা জানেন, যখন অনাবৃষ্টি হয় এবং এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বৃষ্টি বর্ষিত হয় না তখন এর শেষ পরিণতি এই হয় যে, কুয়াগুলোও শুকিয়ে যেতে আরম্ভ করে। অতএব যেরূপে প্রাকৃতিকভাবে আকাশের পানি পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করে, সেরূপে আধ্যাত্মিকভাবে আকাশের পানি অর্থাৎ খোদার ওহী হীনবুদ্ধিসম্পন্ন লোকদেরকে সজীবতা দান করে। অতএব এ যুগও এ আধ্যাত্মিক পানির মুখাপেক্ষী ছিল।

আমি আমার দাবীর ব্যাপারে এতখানি বর্ণনা করা জরুরী মনে করি, আমি ঠিক প্রয়োজনের সময় খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি। যখন এ যুগে অনেকে ইহুদীর রঙ ধারণ করেছে এবং তারা কেবল তাকওয়া ও পবিত্রতাকেই ছেড়ে দেয় নি, বরং হযরত ঈসা (আঃ)-এর যুগে যে সকল ইহুদী ছিল তাদের ন্যায় সত্যের দুশমন হয়ে গেছে, তখন এর মোকাবেলায় খোদা আমার নাম মসীহ্ রেখে দিলেন। আমি কেবল এ যুগের লোকদেরকে আমার দিকে ডাকছি না, বরং স্বয়ং যুগও আমাকে ডেকেছে।

Paygham-e-Suleh

(Message of Peace)

(Published in 1908 A.D)

The holy founder of Ahmadiyya Muslim Jamaat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, promised Messiah & Mahdi[as] has categorically stated in this book that the main cause of conflict and communal disturbance between the Hindus and Muslims of India (i.e undivided India) is related to religion and not politics. He has therefore given a clarion call to these two major communities of the Sub-continent to make a treaty for the purpose of establishing peace. But such a peace-treaty, he opined, is not possible as long as these two communities attack the recognised prophets and the holy divine books of each other.

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad[as] says, "we never condemn the prophets of other communities and rather believe that all of them have been sent by Allah. As such, it is our belief that the Vedas have been revealed by the same Allah, Who revealed the Holy Quran. We therefore respect the holy saints of Vedas. Similarly he appealed to the Hindus to accept Hazrat Mohammad[sm] as a true prophet of Islam and advised them not to hate him.'

He emphatically states, only under these circumstances the real cause of conflict between the Hindus and Muslims can be eradicated and peace and harmony be established in this Sub-continent. Details of the proposed peace treaty have been elaborately chalked out in this book by the promised Messiah & Mahdi[as].

Paygham-e-Suleh

(Message of Peace)

By

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

Promised Messiah & Imam Mahdi[as]

Translated into Bengali by :

Allama Zillur Rahman

Revised Translation by :

Nazir Ahmed Bhuiyan

Published by :

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh

Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211, Bangladesh